- লীলা মজুমদার • সত্যজিৎ রায়
- সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় • শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
- সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় • মহাশ্বেতা দেবী
- ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য • নবনীতা দেবসেন
- অদ্রীশ বর্ধন • নলিনী দাশ • ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়
- মঞ্জিল সেন

AG

দুই দশকের নির্ব্বাচিত

কিশোর গল্প সংকলন

সম্পাদনা

মঞ্জিল সেন

বুক ফ্রেণ্ড ৮/১/বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৭৩

DUI DASAKER NIRBACHITA KISHORE
GALPA SANKALAN
Edited by : MANJIL SEN

প্রথম প্রকাশ—১৯৮৫ ডিসেম্বর

প্রকাশক :
রবীন্দ্রনাথ চন্দ্র
নন্দিতা পাবলিশার্স
১৩৮/৯ এন. এম. রোড
কলিকাতা-৭০০০১১

অলংকরণ (সৌজন্যে)
সত্যজিৎ রায়
দেবাশীষ দেব
সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়
ও
বিদ্যা অশোক

প্রচ্ছদ :
অঞ্জন ঘোষ

মুদ্রাকর :
গোবিন্দলাল চৌধুরী
স্যাঙ্গুইন প্রিন্টার্স
২, ছিদাম মুদি লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

দাম :
বারো টাকা মাত্র।

ভূমিকা

এক বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকার সমালোচনায় পড়েছিলাম ছোটদের জন্য লিখতে গেলে যে লেখার পাকা হাত দরকার তা অনেকেই বোঝেন না। ফলে, "ছোটদের জন্যে এমন অনেকে কলম ধরেন যাঁদের ধারণা, ছোটদের পাতে যাহোক করে একটু কিছু দিলেই তাদের মনরক্ষা করা যায়। ভাব, ভাষা, বানান, ছাপা, ছবি—সব কিছুতেই একটা দায়িত্বহীন হেলাফেলার ভাব। শিশুকে যেমন ভেজাল খাবার দেওয়া অপরাধ তেমনি সাহিত্যেও ছোটদের ভেজাল জিনিস পরিবেশন করাও কম অপরাধ নয়।"

ওপরের মন্তব্য যে নির্ভেজাল, খাঁটি, এ বিষয়ে কোন মতভেদ থাকতে পারে না। ছোটদের, বিশেষ করে কিশোরদের মনে জানবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল তাদের যদি এ সময় জ্ঞান—স্পৃহা মেটাবার মত ভাল কাহিনী পরিবেষন করা না যায় সেটা আমাদেরই অক্ষমতা। ছোটদের ফাঁকি দেবার চেষ্টা এক অর্থে নিজেদের ছেলেমেয়েদেরই প্রাপ্য বস্তু থেকে বঞ্চিত করা—প্রবঞ্চনা।

এ কথা মনে রেখেই এই সঙ্কলনে হাত দিয়েছিলাম, সত্যিকার একটি ভাল গল্পের সঙ্কলন কিশোরদের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলাম, কতটা সফল হয়েছি তার বিচারের ভার কিশোর বন্ধুদের হাতেই ছেড়ে দিলাম। তবে এই সঙ্কলনের কাগজ, ছাপা ইত্যাদি আরও ভাল হবার অবকাশ ছিল, কিন্তু উপর্যুপরি কয়েকটি বিপর্যয় প্রকাশকের সেই সদিচ্ছায় বাদ সেধেছে, প্রুফ দেখার ব্যাপারেও অনিচ্ছাক্রমে কিছু অসুবিধে হয়েছে, যার দায়িত্ব সম্পাদককেই বর্ত্তাবে।

মঞ্জিল সেন।

এই সঙ্কলন প্রকাশের জন্য সম্পাদক ও প্রকাশক
'সন্দেশ' পত্রিকা এবং বিশেষ করে শ্রীযুক্তা নলিনী
দাশের কাছে কৃতজ্ঞ।

এই সঙ্কলন প্রকাশের জন্য সম্পাদক ও প্রকাশক 'সন্দেশ' পত্রিকা এবং বিশেষ করে শ্রীযুক্তা নলিনী দাশের কাছে কৃতজ্ঞ।

ঃ উৎসর্গ ঃ

শ্রীযুক্তা লীলা মজুমদারকে

—মঞ্জিল

ঃ সূচীপত্র ঃ

লীলা মজুমদার

সত্যজিত রায়

মহাশ্বেতা দেবী

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

নলিনী দাশ

নবনীতা দেবসেন

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

অদ্রীশ বর্ধন

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

মঞ্জিল সেন

মগের মুল্লুক
লীলা মজুমদার

কুঁড়োখুড়ো সর্বদা সব কিছুতে ভুলভাল করে, একেকটা অদ্ভুত কাণ্ড বাধায়। গত পূজোর ছুটিতেও যে তাই করবে তাতে আর আশ্চর্যটা কি? এদিকে যখন তখন চটের থলিতে ভরে পাকা পাকা জলপাই, বিলিতী আমড়া, কামরাঙা, চীনে করমচা, সজনে ডাঁটা, বকফুল ইত্যাদি এনে আমাদের ঘুপসিডাঙা লেনের সমস্ত গিন্নিদের এমনি খুশি করে রেখেছে, তাঁরা সব ওর কথাতেই ওঠেন বসেন। অবিশ্যি তাতে দাবা বোড়ের কোনো আপত্তি নেই। বরং সুবিধাই হয়।

এবারো রান্নাঘরের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে যখন বলল, উত্তর কলকাতায় বারোমাস থাকলে কেউ মানুষ হয় না, বুঝলেন বড় বৌঠান, মেজবৌঠান। সকলের মাঝে মাঝে বাপ-পিতেমোর আদিম ভিটের ধূলো লাগানো উচিত। দাবা-বোড়েকে বরং দিন আষ্টেকের জন্য আমার সঙ্গে দিন, দেশ-গাঁটা একবার দেখিয়ে আনি। সেই সঙ্গে খাঁটি ঘি, ঘানির তেল, নিজেদের পুকুরের মাছ আর নিজেদের ভিটের মানকচু খাইয়ে চেহারাগুলো এমন পাল্টে আনি যে আর বাঁদর বলে চেনা যাবেনা।'

সঙ্গে সঙ্গে মা-জেঠিমা কোত্থেকে দুটো ছোট ছোট টিনের সুটকেস গুছিয়ে, খুড়োর হাতে ওদের সঁপে দিলেন। ওরা কোনো আপত্তি করল না, বেরুতে পারলেই বর্তে যায়। নিজেরাও দিনরাত অংকে ভুল করছে, কাজেই কুঁড়োখুড়োর বড় বড় ভুলগুলোও ওরা মাইণ্ড করত না।

শিয়ালদার ভেতর দিককার ছোট স্টেশনটা থেকে নাকি ওসব জায়গায় যেতে হয়। টিকিট কেটে একজন অচেনা লোকের পরামর্শে সবচেয়ে সরু প্ল্যাটফর্মের দুতিনটে তক্তা-ওঠা ময়লা সবুজ বেঞ্চিতে বসে পড়ে জঘন্য ঘেমো রুমাল দিয়ে ঘাড় মুখ মুছে, খুড়ো বলল, 'যাক,

তাহলে আমাদের ধেড়ধেড় গোবিন্দপুর ক্লাবের খেলায় এগারোটা লোকই নামাতে পারব। লাটুবাবাজির মুখখানা দিস কাইণ্ড অব স্মল হয়ে যাবে! এই সেরেছে! খাবারের পুঁটলিটা বোড়ের হাতে। দে, দে ওটা আমিই রাখি, আমার তো হাত খালি! তোরা হয়তো এখনি খেয়ে ফেলবি!'

পুঁটলি দিয়ে দাবা বোড়ে বসতে যাবে, এমন সময় ঠ্যান ঠ্যান করে কোথায় একটা ঘন্টি বাজল, বেঞ্চিটা কেমন একটু নড়েচড়ে উঠল, অমনি ভিড়ের মধ্যে একটা হুড়োহুড়ি লেগে গেল। যত সব গেঁয়ো লোকের দঙ্গল। তাদেরি মধ্যে একজন খুঁড়োর কোঁকে কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে বলল, 'আঁ করে দেখছ কি? ঐ লাটফর্মে ঐ লাটফর্মে! এই ছাড়ল বলে!' এই বলে উঠিপড়ি করে নড়বড়ে ওভারব্রিজের দিকে ছুটল।

কুঁড়োখুড়োও দেখতে দেখতে ওভারব্রিজ পেরিয়ে ঐ লাটফর্মে। পেছন পেছন ল্যাজের মতন দাবা বোড়ে। সেখানে ছোট্ট একটা রেলগাড়ি দাঁড়িয়ে। বাস্তবিকই ওরা যতক্ষণে হাঁচড়পাঁচড় করে শেষের দিকের একটা গাড়িতে উঠে পড়েছে, ততক্ষণে পুঁ-উ-উ করে সিটি দিয়ে এক রাশ কালো ধোঁয়া ছেড়ে গাড়িও চলতে শুরু করে দিয়েছে।

গাড়িতে বেশ ভিড়, লটবহর। তারি এক কোণে ওরা তিনজনে ঠেসাঠেসি করে বসে পড়ল। সরু সরু কাঠের বেঞ্চি। তাতে চেপে খুড়ো একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল, 'উঃফ্! আরেকটু হলেই ফেঁসে যেত! খাবারের পুঁটলিটা দেখছি না কেন?'

ওরা শুনে অবাক। 'তুমিই না বললে আমরা খেয়ে ফেলব, তোমার কাছে নিরাপদে থাকবে!'

খুড়ো দুচোখ কপালে তুলল, 'কি জ্বালা! জানিস তো আমার ভুলো মন। মনে করে তুলে আনতে পারলি নে! এখন কত বেলা অবধি শুকিয়ে থাকতে হবে কে জানে!'

ফশ করে পাশের বেঞ্চি থেকে একটা লোক বলল, 'তা থাকতে হবে কেন? আমার এই থলিতে সব কিছু আছে। কি খাবে বল

বাবারা?' দাবা বলল, 'মুড়ি মোয়া', বোড়ে বলল, 'লুচি-হালুয়া-' শালপাতায় মুড়ে তাই বের করে দিল লোকটা। খুড়ো যখন বলল, 'ছাঁচি পান আছে?' তাও দিল।

খুড়ো বলল, 'তুমি বড় ভালো', লোকটা তামার টিপ পরা দাঁত বের করে হেসে বলল, 'বেওসা আজ ভালো হয়েছে তাই ভালো। বেওসা খারাপ হলে ভালো থাকি না।' খুড়ো পয়সা দিতে গেলে লোকটা ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ-উটি কর না দাদা! বললাম না ভালো কামাই হয়েছে। পয়সা নিলে পাপ হবে। ভেল্কিবাজের

অনিশ্চয় জীবন, বুঝলে দাদা! গুণিনের হুকুম, ঘড়িতে যেই না বারোটা বাজল, অমনি বেওসা বন্ধ।'

দাবা বোড়ে শুনে হাঁ! বোড়ে বলল, 'কেন বন্ধ?' লোকটা বলল, 'তা হবে না, সূয্যি তখন মাঝ গগনটি টপকায়। ইদিকে এক ঠ্যাং উইদিকে এক ঠ্যাং। সময়টা বড় খারাপ। তা বাবাদের যাওয়া হচ্ছে কোথায়?' দুজনে একসঙ্গে বলল, 'ধেড় ধেড় গোবিন্দপুর।' লোকটা উঠে দাঁড়িয়েছিল, থপ্ করে আবার বসে পড়ল, 'এ্যাঁ! সে তো এ লাইনে লয় গো! শেষটা ভুল গাড়িতে ছেলেপুলে নিয়ে চেপলেন, দাদা!'

খুড়ো দাবার মোয়াতে একটা বড় কামড় দিল, 'বাঃ, বেড়ে জিনিস! তা ভুল তো হতেই পারে। এখন মনে হচ্ছে উদিককার

লাইনে গাড়ি ধরতে হয়। সারাক্ষণই ভুল করি ভাই। ঠিক কিনা, তোরাই বল।'

ওরা দুজন উৎসাহের সঙ্গে বলল, 'একদম ঠিক।'

লোকটার বোধ হয় বেশ বয়স। চল্লিশ-টল্লিশও' হতে পারে। রোগা ফরসা, কোঁকড়াচুল, একটুখানি ছাগল দাড়ি, পরণে কালো ঝোলা পাঞ্জাবী, আঁটো-পায়ের পাজামা, আর অদ্ভুত কাজ করা নাগরা। কেউ পরে না অমন। ওদের সেদিকে তাকাতে দেখে লোকটা বলল, 'কেন? কি এমন খারাপ? এটা আমার ঠাকুরদা পরতেন, তারপর বাবা পরতেন, এখন আমি পরি। খারাপ বলতে চাও?' ওরা জোরে জোরে মাথা নাড়ল। 'এখন তোমাদের নিয়ে কি করব ভাবছি।'

খুড়ো বলল, 'তা, তুমি কোথায় নামবে?'

লোকটা বলল, 'এ লাইনে তো একটাই ইস্টিশন, সেখানেই নামব। সবাই নামবে। তোমরাও। এই তো এসেও গেলাম।'

বলতে বলতে গাড়িটা গড় গড় করে আরেকটু এগিয়ে একটা ইটের গাদার সামনে পৌঁছে থেমে গেল। হুড়মুড় করে গাড়ি খালি করে সকলের সঙ্গে ওরাও নেমে পড়ল। নতুন সাইন বোর্ডে স্টেশনের নাম লেখা, 'মগের মুল্লুক।' তাই দেখে দাবা বোড়ের কি হাসি, 'কি বিতিকিচ্ছিরি নাম রে বাবা!' লোকটাও হেসে বলল, 'তা বাবা তোমাদের ধেড়ধেড় গোবিন্দপুরই বা কি এমন ভালো নাম? চল, এখনো বেলা আছে। দেশটা ভালো করে দেখিয়ে দিই। বড় সরেশ থান। আগে একটু চা খাওয়াও, দাদা! এনারা সকলে পয়সা খরচ করে দেখতে এয়েছেন!'

ইটের গাদার গা ঘেঁষে খড়ের চালের চা-দোকানে চারটে করে ইটের ওপর বসে মস্ত ভাঁড়ে কি ভালো চা যে খেল চারজনে সে আর কি বলব! যেমনি সুগন্ধ, তেমনি তার স্বাদ। দাম কুড়ি পয়সা করে। দোকানদার বলল, 'তা হবে না আর? এ তো আর জংলি ঝোপের পাতা শুকিয়ে তৈরি লয়। বাজার থেকে তাজা বাঁধাকপির

বাইরের পাতা চেয়ে এনে রোদে শুকিয়ে আকের গুড় দিয়ে সেঁকে আমার গিন্নি নিজের হাতে বেনিয়েছেন। চিনিও লাগে না।' ছাগল-দাড়ি বলল, 'অত গিন্নি গিন্নি করনা বাপু! লজ্জা করে।' এই বলে উঠে পড়ল।

খুড়োও পয়সা দিয়ে চা-দোকান থেকে বেরিয়ে এল। বাইরে রেলগাড়ির অন্য যাত্রীরাও অপেক্ষা করছিল। বেরিয়েই লোকটা বলল, 'আমারি নাম মগ। এটা আমার দেশ তাই স্টেশনের নাম মগের মুল্লুক। তোমরা কি আর কিছু ভেবেছিলে?' ওরা বলল, 'না, না মোটেই না।'

'তো আমাকে মগা বলে ডাকলেই খুশি হব।'

মগা তখন সকলকে ডেকে বলল, 'সবার আগে পাহাড় চড়া দেখবে চল। সে বড় ভয়ংকর ব্যাপার। পেরাণ একটা হাতে করে, কোমরে দড়ি বেঁধে, অন্য হাতে লোহার ফলা লাগানো লাঠি ধরে, ভালুকের সাজ পরে, ভূতো চশমা এঁটে শামুকের মত পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে হয়।'

একজন দর্শক অবাক হয়ে বলল, 'এ্যা, বল কি? শামুকরা হাতে লাঠি নিয়ে পাহাড় চড়ে নাকি?' মগা ভারি বিরক্ত হয়ে বলল, 'দেবে তো কুড়ি পয়া, অত তং রেখে নিজের চোখেই দেখবে চল। তোমাদের অত কিছু করতে হবে না। নয়তো কি বলছি।' এই বলে হন হন করে এগিয়ে গেল।

পাহাড় বলে পাহাড়। চূড়ো গিয়ে আকাশে না ঠেকলেও গড়ের মাঠের মনুমেণ্ট তো হবেই। তাই শুনে মগা বলল, 'তবেই বোঝ! ওতে আর হিমালয়তে কতটুকুই বা তফাৎ! মাথায় বরফ নেই, এই যা! তা, শহরশুদ্ধু সবাই অত বিড়ি খেলে কখনো বরফ জমে!—ঐ হাঁড়াতে পিত্তেকে কুড়িটা পয়সা ফেলে, দুজনের পেছনে দুজনে ডবল সারি দিয়ে ঝরনাতলার সামনে দাঁড়াও দিকি। কপিকলে ওপরে তুলে দেবে। প্রকৃতির শোভা দেখে মুচ্ছো যাবে।'

কি আর বলব! কপিকলে পাহাড় চড়ার কথা শুনেই ভিড়ের

তিন ভাগ কপ্পূর হয়ে গেল! দাবাবোড়ে চেয়ে দেখে জনাসাতেক যারা বাকি আছে তারা কেউ গাঁয়ের লোক নয়। লা-ল-সবুজ শার্ট, নীল জীন পরা, হাতে ঘড়ি আর চ্যাপ্টা ব্যাগ, পকেটে কলম, থেকে থেকে থাবড়ে দেখছে চুরি যায়নি তো। আর তাদেরি একজনার বগলে খুড়োর খাবারের পুঁটলি। তাই দেখে দাবা-বোড়ের একসঙ্গে সে কি চিল-চ্যাচানি! 'এ্যঁা! ওতে আমাদের ছানার দোলমা আর আলুর পরটা আছে, দিনুময়রার প্যাঁড়া আছে!' শুনে পুঁটলি দেওয়া দূরে থাকুক, সে লোকটা সেটা আঁকড়ে ধরল, বাকিরা ওকে ঘিরে দাঁড়াল! খুড়ো দাবা-বোড়ের পেছনে গিয়ে, 'ওঁ মগাঁ! এঁটা কিঁ হঁল!' বলে হাঁক ডাক করতে লাগল।

মগা ভারি বিরক্ত, 'আহা, ওনারা খগুরে-কাগুজে মানুষ ওনাদের চটাতে নেই। শেষটা রেগেমেগে আমার নামে যাতা লিখে দিলেইত হয়ে গেল আমার বেওসা! কিন্তু ঐ গেরস্তপোষা পুঁটলির খাবার কি আপনাদের জিবে শানাবে, ও বাবুরা! আর দিনু ময়রা তো প্যাঁড়ায় গোলমরিচ দেয়। আমি নিজে দেখেছি। দিয়ে দেন। আমার ভেল্কির থলি থেকে আপনাদের ভালোমন্দ দুচার পীস যা খাওয়াব না—সে জন্মে ভুলবেন না! ভেল্কি বলে কথা! আগে পাহাড়ে ওঠা যাক তো।' অমনি ওরা 'কিছু মনে কর না ভাই, ঠাট্টা কচ্ছিলাম।' বলে পুঁটলিটা খুড়োর হাতে ধরে দিল।

মগা খুশি হয়ে বলল, 'সব্ব সাকুল্যে মোটে তো দশজন হল। ঝরণা তলার দুপাশে পাঁচজন-পাঁচজন করে দেঁড়িয়ে যান দিকি, আমি এই এলাম বলে।' বলে হাওয়া। এই ছিল, এই নেই। কুঁড়ো খুড়ো বলল, 'লুকোবার জায়গা নেই তা লুকোল কোথায়?' 'ঘাবড়িও না খুড়ো, যত বিপজ্জনক ব্যাপারই হোক, তোমার ঐ ধেড়ধেড় ইলেভেনের চেয়ে শতগুণে নিরাপদ হবে তাতে সন্দ নেই।' খগুরে কাগুজেরা বলল, 'রাইট! যদি ময়দানের অদ্ধেকও হয়, তবু সেফার!'

বলতে বলতে ঝরনা তলায় হাজির। সেখানে কলকল ঝরঝর করে ধোঁয়া ধোঁয়া পাহাড়চূড়ো থেকে সোজা একটা ধারায় জল

নেমেছে। কি তার রূপ! সিঁড়ি-প্যাটার্নের পাহাড়ের গা দিয়ে যেন ঢল নেমেছে, রোদ যেখানে ঝকঝক কচ্ছে, গুঁড়োগুঁড়ো জল ছিটোচ্ছে, তাতে আলো পড়ে রামধনু রং বেরুচ্ছে। কি তার শোভা! ছোট-বড় নানা গাছে পাহাড়ের গা ঢেকে আছে, কারো পাতা সবুজ, কারো হলুদ, কারো লাল। কোথাও বা থোকা থোকা ফুল ফুটেছে, কোথাও মস্ত মস্ত কলার কাঁদি ঝুলছে। দেখে চক্ষু জুড়োয়। নাকে একটু ওষুধ-ওষুধ গন্ধ লাগে।

খুড়ো বলল, 'আহা, এইখানেই না গঙ্গোত্রী! নমো কর, নমো কর।' বলতে বলতে শুধু ওরা কেন, খগুরে কাগুজেরাও এক বাক্যে সবাই মাটিতে মাথা ঠেকাল। ওরা সর্বদা মন খোলা রাখে, নইলে ভালো খগুরে-কাগুজে হওয়া যায় না। যা দেখে, যা শোনে, অমনি নোট বইতে টুকে টুকে নেয়। পরে একটু বদলে-বাৎলে, সব কাগজে ছেপে দেয়। সত্তর-আশী পয়সা দাম দিয়ে লোকে সেগুলো কিনে পড়ে।'

এদিকে যেই না সবাই মাটিতে মাথা ঠেকিয়েছে, অমনি কড়কড় ঝড়ঝড় করে মস্ত এক লোহার পাখি এই বিরাট হাঁ করে, হয়তো পাহাড়-চূড়ো থেকেই নেমে এসে, দুপাটি ফোকলা মাড়ির মধ্যিখানে কপ করে ওদের তুলে নিল। বড়রা সবাই তক্ষুণি জড়াজড়ি করে অজ্ঞান-অচেতন। দাবা-বোড়ে পাখির গায়ের খুদে খুদে ফুটো দিয়ে অবাক হয়ে পাহাড়ের গায়ের আশ্চর্য দৃশ্য দেখতে লাগল। এযে সাক্ষাৎ হিমালয়, শীগ্‌গিরি তার অনেক প্রমাণও পাওয়া গেল।

সে বড় অদ্ভুত পাহাড়। তার গায়ে কতশত গুহা গহ্বর। তাতে কি আশ্চর্য সমস্ত দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। একটাতে দুই বুড়ো দাবা খেলছেন। মনে হল একেকটা চাল নিয়ে এতক্ষণ ভেবেছেন যে কতদিন কেটেছে, মাস গেছে, এমন কি কত বছর কেটে গেছে। তাঁদের শাদা চুলদাড়ি লম্বা হয়ে মেঝের ওপর লতিয়ে গেছে। ছাদ থেকে মাকড়সারা জাল বুনে চাঁদোয়া বানিয়েছে। যারা দেখছে তারাও পাথর বনে গেছে। দেখতে দেখতে সে গুহা ছাড়িয়ে লোহার

পাখি আরো খানিকটা উঠে গেল। কোঁকে গুঁতো খেতে দাবা ফিরে দেখে ওর মাথার ওপরকার ফোকর দিয়ে একজন যন্তরে চলন্ত ফটো তুলছে। ঐ দিয়েই সিনেমা হয়। ঐ করেই সত্যজিৎ রায় এমন বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন। ন-কাকা প্রায়ই বলেন, কোনো রকমে একটা ছিনে-ক্যামেরা পেলে আর দেখতে হবে না।

বোঝাই যাচ্ছে এতক্ষণে অন্য লোকগুলো অনেকখানি সামলে উঠে পাখির গায়ের শত-শত ফুটো-ফাটল দিয়ে বাইরে দেখছে আর মুগ্ধ হয়ে বলছে, 'আহা! এ-দেশের তুলনা কোথায়? আর পর্বতকন্দরে বাস করা বলে কথা! ঐ দেখ, অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহরা প্রায় অমরত্ব পেয়ে কেমন অনন্তকাল দাবা খেলায় মত্ত আছেন। ওঁদের একেকটা চালের মধ্যিখানে নিচের পৃথিবীতে কত সাম্রাজ্যের উত্থানপতন ঘটে যাচ্ছে!' আর একজন খণ্ডরে বলল, 'আর সায়েবরা বলে কিনা শতরঞ্চি খেলা ফারশিদের আবিষ্কার! সব কথা যখন কাগজে ফাঁশ করে দেব, বাছাধনরা টের পাবেন!' এই বলে খসখস করে যে যার নোট বইতে কি সব লিখে রাখল।

এই সময় পায়ের কাছে চিঁ চিঁ করে কথা শোনা গেল। 'তোমরা আমার পেট থেকে পা না ওঠালে আমি কি করে'—এই অবধি শুনে জিবটিব কেটে ওরা খুড়োকে টেনে তুলল। 'এ ছি! ছি! দেখেছেন কাণ্ড স্যার! কিছু মাইণ্ড করবেন না!'

খুড়ো গা থেকে ধূলো ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, 'নিচে বোধহয় আরেকজনও আছে। কি রকম নরম-নরম গরম-গরম টের পাচ্ছি।' 'এ্যা! বলেন কি!' ঠিক তাই। আরেকটা ফ্যাকাশে রোগা লোকও উঠে একটা তাকের ওপর বসে হাসিহাসি মুখে মুণ্ডু দোলাতে লাগল। বোধহয় চাপ খেয়ে ঠিক প্রকৃতিস্থ ছিল না। কিন্তু প্রথম খণ্ডরে তার নাকের কাছে একটা সবুজ শিশি খুলে ধরতেই মাথা ঝাঁকিয়ে তেজী গলায় সে বলল, 'সব রিপোর্ট করব।' বাকিরা ওর পিঠে হাত বুলিয়ে বলতে লাগল, 'যা হবার তা হয়ে গেছে ভাই। ক্ষমা দাও। কুকুর কুকুরের মাংস খায় না—'

খুড়ো হঠাৎ মহা রেগে চ্যাচাতে লাগল, ইস! দেখেছ! বেটাচ্ছেলে নিচে শুয়ে শুয়ে আমাদের টিপিনটে চেঁচেপুঁছে সাবাড় করেছে!'

সে বলল, 'না করলে উঠে বসবার জোর পাব কোথায়? তুমি তো এতক্ষণ আমাকে পাটি বানিয়ে পেটের ওপর শুয়েছিলে!' এরপর কি হত বলা মুস্কিল ঠিক ঐ সময়ে দাবা-বোড়ে একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, 'ঐ যে! ঐ যে! এভারেস্ট—যাত্রীর দল!' অমনি সবাই হুড়মুড় করে নিজের নিজের ফুঁটোর ফাটলে চোখ লাগাল।'

বাস্তবিক সে দৃশ্য ভাবা যায় না। জনা আষ্টেক লোক, এক-জনের সঙ্গে আরেকজনের কোমরে দড়ি-বাঁধা অবস্থায় মহাশূন্যে ঝুলে আছে। প্রত্যেকে হাতে হাতুড়ি-বাটালি জাতের অস্ত্র নিয়ে ঠুকঠুক করে বোধ হয় পা রাখার জায়গা বানিয়ে নিচ্ছে। আরেকটু ওপরে আর একটা গুহার মুখ দেখা যাচ্ছে। সেখান থেকে বাষ্পের মতো ধোঁয়া বেরোচ্ছে। ভেতরে মনে হল প্রাচীন কালের সন্ন্যাসীরা খাটো লুঙ্গী পরে ঘোরাফেরা করছেন। গন্ধকের গন্ধ নাকে আসছে।

দ্বিতীয় খগুরে বলল, 'আমার হিমযাত্রী বইটার তুমি এত নিন্দে করলে, ঐ দেখ বর্ণে বর্ণে সত্যি কিনা! ঐখানে গরম জলের উৎস আছে। হিমালয় যাত্রীরা তাতে চান করলে সব জ্বালা যন্ত্রণা দূর হয়, কাটা-ছড়া, ঘা-ফোঁরা সেরে যায়। ঐ রকম গুহায় আমার দিদিমার দাদামশাইয়ের বুকের ওপর প্রকাণ্ড এক অজগর রোজ রাতে এসে শুয়ে থাকত, কিছু বলত না—' একথা শুনে 'কই? কই?' করতে করতে সকলে সেদিকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে দেখে ততক্ষণে লোহার পাখি ওদের নিয়ে আরো কতদূর উঠে গেছে!

পটভূমিকা বদলে গেল। বড় বড় ঝুলো পাতার গাছের বাড়া-বাড়ি। বেশিদূর চোখ যায় না। তারি মধ্যে নাকে এক বিদঘুটে গন্ধ এল। বোড়ে আঙুল দিয়ে দেখাল, 'ঐ যে হিমালয়ের কটা ভালুক। সব জীবজন্তুর চেয়ে হিংস্র। অকারণে আক্রমণ করে। হিমালয়ের আতঙ্ক। ভূগোল স্যার বলেছেন।' সঙ্গে সঙ্গে দাবা-

বোড়ে ছাড়া সবাই ফোকর থেকে চোখ সরিয়ে জড়োসড়ো হয়ে বসে পড়ল। কটা ভালুক মূলো খাচ্ছিল, কিচ্ছু বলল না।

এর পরেই লোহার পাখি আস্তে আস্তে পাহাড়চূড়োয় নেমে পড়ল। নেমেই এই বড় হাঁ করল আর তার পেটের ভেতর থেকে সবাই হুড়মুড় করে আথালি-পাথালি ওপরকার নরম বালির ওপর পল, তাই রক্ষে। পড়েই বড়রা আর একবার হাত-পা এলিয়ে অজ্ঞান। পারেও বটে! দাবা-বোড়ে তাদের ঠেলে ঠুলে সরিয়ে উঠে দাঁড়াল!

সে কি দৃশ্য! এ যে সগ্‌গ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ফুলে ভরা এক গাছতলায় ছোট নীল পুকুর, তাতে দুদিকে মুখ করে পিঠো পিঠি বসে দুই বুড়ো মাছ ধরছেন। একটা বিশাল মাছ থেকে থেকে ঘাঁই মারছে। লোহার পাখির পিঠের ওপর থেকে খচমচ করে মগা নেমে এসে বলল, 'সগ্‌গে শুভানুগমন হক। এঁরা আমার বুড়ো ঠাকুরদারা তিনপুরুষ কথাবার্তা বন্ধ। বেজায় রেষারেষি। পুকুরে ঐ একটাই মাছ। তাকে নিয়েই সত্তর বছর দুই শরিকে ঝগড়া! মাছের বয়সটা ভাব! ই কি! এঁরা যে মুচ্ছো ভেঙে ফোটো তুলছেন! ওয়া, ওয়া! ঠিক যেন ফিল্ম তুলছে।' খগুরেরাও খুদে রেকর্ডারে মগের সব কথাবার্তা তুলে নিচ্ছে। মগা একটু হকচকিয়ে গেছে মনে হল।

হেনকালে একটা বাধা ঘটল। দুই বুড়োর ফাৎনার দিকে চোখ আর কিছুতে হুঁশ নেই। এমনি সময়ে টুপ করে বড় বুড়োর ফাৎনা ডুবে গেল। তার পরেই প্রায় একটা মোষের মত বড় মাছের মাথা পাড়ির কাছে ঘাঁই দিয়েই আবার ডুব। তিন পুরুষের মেছুরেরা এমন ব্যাপার ভাবতে পারেনি। সবাই জানে ও মাছ ধরবার জন্যে নয় আজ সেই কিনা টোপ গিলল! এতকাল পরে দুই বুড়ো পরস্পরের দিকে চাইল। এদিকে সুতোসুদ্ধু বঁড়শী গিলে মাছের পিলে চমকে গেছে! অমনি ছুট দিয়েছে! সুতোয় টান পড়েছে!

ছোট বুড়ো আর থাকতে না পেরে চেঁচিয়ে বলল, 'দেখছ কি, স্যাঙাৎ? সুতো ছাড়, সুতো ছাড়, নইলে ছিঁড়ে পালাবে!' হুড়

হুড় করে সূতো ছাড়া হল। দাবা-বোড়ে খুড়ো, মগা, খগুরে কাণ্ডজেরা, সেই রোগা লোক, সবাই মিলে পুকুর পারে দাঁড়িয়ে গেল। কি-র্-র্-র্-র্ করে সিনে-কোড্যাক চলল, টেপ-রেকর্ডার খোলা রইল। প্রত্যেকটি দৃষ্ট বস্তু, প্রত্যেকটি কথা আর শব্দ সব ধরা পড়তে লাগল।

সত্যি বলব, মাছের খেলের এমন ছবি এদেশে আর কেউ তোলেনি। আর সে কি খেল্। না দেখলে বিশ্বাস হয় না। কম্পিউটারের সাহায্যে একজন খগুরে গুণল, সাড়ে পাঁচশোবার পুকুরটাকে বেড় দিয়ে, মাছটা যখন ঘাটের কাছে আরেকবার ঘাঁই দিয়েছে, তার জিব বেরিয়ে পড়েছে। ছোট বুড়ো আর থাকতে না পেরে, ছিপ ফেলে দিয়ে, কোমর জলে লাফিয়ে পড়ে, তাকে জাপ্টে ধরে ডাঙায় তুলে ফেলল। বড় বুড়োও তার ছিপ ফেলে ছোট বুড়োকে বুকে জড়িয়ে ধরল। ঠিক তখুনি তারা দুজনে এবং মাছ একসঙ্গে মুচ্ছো গেল। মগা ছুটে এসে, প্রাণ তুচ্ছ করে মাছের মুখ থেকে বঁড়শী খুলে, তাকে ঠেলে আবার জলে ফেলে দিল। অমনি মাছও চিড়বিড়িয়ে উঠে পুকুরের অন্যপাড়ের কাছে গিয়ে ডুব দিল। মনে হল খুব বিরক্ত হয়েছে। এবার সিনে ক্যামেরা বন্ধ করে সে লোকটা বলল, 'বাঃ, ফাইনেলটা পর্যন্ত গ্র্যাণ্ড হয়েছে! নাম দেব "একদিন স্বর্গধামে!" খরচ-খরচা ছাড়াও আপনি লাখ-টাকা পাচ্ছেন।'

খুড়ো বলল, 'আর আমরা? চিমড়ে আমাদের টিপিন খেয়ে ফেলেছে তার ক্ষতিপূরণ কে দেবে?'

ক্যামেরাম্যানের বন্ধু একগাল হেসে বলল, সেটাও তুলেছি। শিয়ালদা থেকে শুরু করে আগাগোড়া সব তুলেছি। গ্র্যাণ্ড হয়েছে। আপনাদের বেঞ্চিতে বসার সংলাপ যা হয়েছে না! না জেনে কি ভালো অ্যাকটিনি করে সবাই। ভয় নেই, আপনারা সক্কলে এক্সট্রাদের ফী পাবেন। সংলাপ জুড়লে এ ছবি সোনার খনি হবে। সকলের লাভ হবে। কিছু বললেন?'

তাই শুনে চিমড়ে এগিয়ে এসে বলল, 'বলিনি, এখন বলব!

আমি গুপ্ত গোয়েন্দা। এই দেখুন আমার লাইছেন। বিনা অনুমতি পত্রে লাভজনক ব্যবসা করার জন্য আপনাকে গ্রেপ্তার করছি। আমার সঙ্গে থানায় যেতে হবে।' শুনে সকলে থ! খুড়ো একটা ঘাস-ওয়ালা মাটির ঢিবির ওপর বসেই আবার উঠে পড়ে পেছন থাবড়াতে লাগল, 'উঃ, লাল লাল ডেওঁ পিঁপড়ে!'

ততক্ষণে মগার চেহারা পাল্টে গিয়ে এমন হয়েছে যে আর চেনবার জো নেই। স্রেফ একটা রাগত বনবেড়াল! ঘোর বুনো ফ্যাচ ফ্যাচ স্বরে মগা বলল, 'চোপ, ইউ—(পরের কথাটা বিশেষ কারণে বাদ দিলাম)—লাভজনক কোথায় দেখলে ছুঁচো কোথাকার? হাড়গিলের মাথায় চেপে স্বচক্ষে দেখিনি যে তুমি দাওনি আমার কুড়ি পয়সা! থানায় যেতে হয় তো নিজে যাও! নিজের বাড়িতে নিজের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব নিয়ে যদি খোক্কশ শিকার করি, তোর তাতে কি রে? কুড়ি পয়সা ফাঁকি দিয়ে আবার কথা! থানায় যেতে হয় নিজে যা। মেহনতি জনতার দিনগুজরানোতে হস্তক্ষেপ করলে সবাই মিলে পিটিয়ে মোজা বানালেও কোনো থানা দোষ দেবেনা'—

খগুরে-কাগুজেরা মাঝখান থেকে বলল, 'বরং বিশিষ্ট বীরত্বের মেটেল দেবে।' তাই শুনে ফুঁটো বেলুনের মত চুপসে গেল চিমড়ে। প্রথম খগুরে কাগুজে নোট বই বের করে বলল, 'তা হাড়গিলেট কে, যার মাথায় চেপেছিলেন?' ভারি লজ্জা পেল মগা। লোহার পাখির গায় হাত বুলিয়ে বলল, 'এনাকে আদর করে হাড়গিলে ডাকি, সব কিছু গিলে বসে থাকেন কিনা।'

দুই নং খগুরে হাড়গিলের কাছে গিয়ে হঠাৎ বলল, 'তা এনার গায়ে ইংরিজিতে ডাবা বোর লেখা কেন?' শুনে দাবা-বোড়ে এমনি চমকে উঠল, যে প্রায় পড়েই যায় আর কি! দাবা বলে উঠল, 'চিনেছি, চিনেছি, এতক্ষণে চিনেছি, এযে সেই পাঁচ মাথার মোড়ের কাছে পাতাল রেলের মাটি-খেগো ছাড়া কেউ নয়। আহা কদ্দিন পরে দেখা!' এই বলে হাড়গিলের গায় হাত বুলিয়ে দুফোঁটা চোখের জল ফেলল!

মগা বলল, 'তা হতে পারে। হওয়া কিছুই অসম্ভব নয়। পাতাল রেলের ব্যাপার তো।' তিন নং খণ্ডরে বলল, 'কিন্তু ২৪ পরগণার মধ্যিখানে হিমালয়টিকে আনলেন কি ভাবে?' মগা ইদিক উদিক তাকিয়ে বলল, 'তাহলে বসেই পড়া যাক, কারণ, সে অনেক কথা।' এই বলে ভেলকির থলি থেকে, কাগজের কুচি জড়িয়ে সক্কলকে ছোট ছোট কচ্ছপের মত দেখতে পাঁউরুটি, আর বড় একদলা কিসমিস দেওয়া হালুয়া বের করে দিল।

তারপর মগা বলল, 'হিমালয় আবার পাব কোথায়? বাপ ঠাকুরদা পৈতৃক ওষুধের বেওসাটি পর্যন্ত তুলে দিয়ে, জমানো ফোঁটা বড়ির গুণে বছরের পর বচ্ছর বহাল তবিয়তে বেঁচে থাকেন, দাবা খেলেন, চান করেন, মাছ ধরেন, আর শরিকের সঙ্গে ওষুধ কোম্পানি নিয়ে কথা বন্ধ করেন। এদিকে কোম্পানির কাজ বন্ধ হয়ে যায়, বংশধররা খেতে পায় না। তাছাড়া জমিজমার তিনভাগে ট্রাকে করে শহরের রাবিশ ফেলে ফেলে বিশাল গন্ধমাদন আপনিই তৈরি হয়ে গেল। তাতে গাছপালা গজিয়ে দিব্যি এক নন্দন কানন তৈরি হল, গর্তে বিষ্টির জল জমে খাশা এক পুকুর হল। তাতে আমাদের চৌবাচ্চায় পোষা বুড়ো মাছটাকে ছাড়া হল। ওষুধ কারখানার নালার জল নতুন রূপ ধরল, হাড়গিলে বেচারা অকেজো হয়ে যাওয়াতে ওকেও দেখি রাবিশ তোলার কাজে লাগিয়ে দেছে! তাকে এনে, ওষুধ করে মাঝে মধ্যে কাজে লাগাই সেটা কি খুব খারাপ হল?

'এদিকে সত্যি বলতে কি, রাবিশের ঢিপির সঙ্গে পাঁচতলা পুরনো পৈতৃক বাড়িটার চেহারার খুব তফাৎ না থাকাতে, রাবিশের গাদা বাড়ির সঙ্গে মিশে গেছে। বাড়িটাও একটা পাহাড় হয়ে গেছে। জানলাগুলো গুহার মুখ হয়েছে। ওপর থেকে কিছু মালুম দেয় না, দেখতে হলে শেকলে করে হাড়গিলেকে ঝোলাতে হয়। ওপাশে আমার গুরুদেবের ভেষজ সমবায়ের লোকরা উৎকৃষ্ট প্রক্রিয়ায় যে সব ওষুধ বানাচ্ছে তাতে ঐ রাবিশ ছাড়া কোনো মালমশলা লাগে না। গুরুদেব বলেছেন পঞ্চভূতের বেশি কিছু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নেই। বিদেশ থেকে মেলা

টাকা দিয়ে যে সব উপকরণ এনে ওষুধ তৈরি করা হয়, এই রাবিশগাদায় তার শতগুণ উপকরণ, মিনি মাগনা, আরো তাজা এবং খাঁটি অবস্থায় পাওয়া যাচ্ছে। ঐ ওষুধ দিয়ে রোগ সারছে, ফসল বাড়ছে, গাইগরুরা বেশি দুধ দিচ্ছে। আর এ ব্যাটা বলে লাইছেন নেই, থানায় চল!'

চিমড়ে মগার পায় পড়ে বার বার বলতে লাগল, 'না স্যার না স্যার, মাপ করবেন, ভুল হয়ে গেছে স্যার! ওটা কিসের কি-র-র-র শব্দ?'

'কিছুই না, ক্যামেরাম্যানরা ছবি তুলছে, কথা রেকর্ড করছে।'

গল্প শেষ করে মগা বলল, 'কাজেই বুঝতে পারছেন. এসব দেখিয়ে দুচারটাকা যা হবে আর ফিল্ম কোম্পানী যা দেবে, সে সবই সৎকাজে লাগানো হবে। একটা গোটা বৃহৎ পরিবারের পুনর্বাসন পুণ্যকাজ। একটাই খুঁৎ ছিল, শরিকে শরিকে কথা বন্ধ, আজ তাও মিটে গেল। আপনারা সকলে আমাদের সঙ্গে খিচুড়িভোগ করে গেলে বাধিত হব। আজ বড় শুভ দিন।'

কুঁড়োখুড়ো উঠে পড়ে এতক্ষণ পরে চিমড়েকে বলল, 'তাছাড়া, তুমি আমাদের টিপিন খেয়েছ, তোমার থানায় যাওয়াই উচিত।' মগা ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'আহা, আহা, আর কেন? ক্ষমা দাও ভাই। আমি খিচুড়ি খাওয়াব।'

খুড়ো বলল, 'খাবার পর কি আবার হাড়গিলে চেপে নিচে নেমে ট্রেন ধরতে হবে?'

মগা হাসল, 'না, না, ওখানে এগজিবিশন হবে, ওটা তার খেলার ট্রেন! তুমিও যেমন। পাহাড়ের ওপর দিয়ে বাস যায়। আধঘণ্টায় খেড়খেড় গোবিন্দপুর পৌঁছে দেবে। কিন্তু কি দরকার যাবার? এখানেই গুহা বাড়িতে দুদিন কাটিয়ে যাও না?'

খুড়ো বসে পড়ে বলল, 'বেশ, তাই হবে।'

দাবা—বোড়ে বলল, 'কিন্তু, ফুটবল খেলাটা?'

খুড়ো হাসল, 'দূর! ভুলেই গেছিলাম সেটা ক্যানসেল হয়ে গেছে!'

———

বিষফুল

সত্যজিৎ রায়

'ওদিকে যাবেন না বাবু!'

জগন্ময়বাবু চমকে উঠলেন। কাছাকাছির মধ্যে যে আর কোনো লোক আছে সেটা উনি টের পান নি ; তার ফলেই এই চমকানি। এবার দেখলেন তাঁর ডাইনে হাত দশেক দূরে দাঁড়িয়ে আছে একটি তেরো-চোদ্দ বছরের ছেলে, তার পরনে একটা ডোরাকাটা নীল হাফ-প্যান্ট, আর গায়ে জড়ানো একটা সবুজ রঙের দোলাই। ছেলেটির রঙ কালো, মাথার চুল গ্রাম্য কায়দায় পরিপাটি করে আঁচড়ানো, চোখ দুটিতে শান্ত অথচ বুদ্ধিদীপ্ত চাহনি। গ্রাম্য হলেও নির্ঘাৎ ইস্কুলে পড়ে। অকাট মূর্খ হলে চোখে অমন চাহনি হয় না।

'কোনদিকে যাব না?' জগন্ময়বাবু প্রশ্ন করলেন।

'ওই দিকে।'

অর্থাৎ জগন্ময়বাবু তাঁর হাঁটার পথে একবারটি থেমে যেদিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন, সেইদিকে।

'কেন, যাব না কেন? কী হবে গেলে?'

'বিষ আছে।'

'বিষ? কিসে?'

'ওই গাছে।'

সত্যি বলতে কি গাছটা দেখেই জগন্ময়বাবু থেমেছিলেন। ফুলগাছ। বুনো ফুল সম্ভবত। রাস্তা থেকে হাত বিশেক দূরে একটা টিপি, তার উপরে ওই একটি মাত্র গাছ। কাছাকাছির মধ্যেও যাকে গাছ বলে তা আর নেই। এ গাছটা কোমর অবধি উঁচু। তেকোনা ছোট ছোট পাতা, আর পাতার ফাঁকে ফাঁকে ভারী সুন্দর হল্‌দে কমলা আর বেগুনী রঙের ফুল। জগন্ময়বাবুর অবাক লাগছিল এই কারণেই যে গত তিন দিন ঠিক এই রাস্তা দিয়েই হাঁটা সত্ত্বেও

ওই ঢিবি আর ওই গাছ ওঁর চোখে পড়েনি। অবিশ্যি হাঁটার সময় অর্ধেক দৃষ্টি পথে রেখেই চলতে হয়, বিশেষ করে সে-পথ যদি
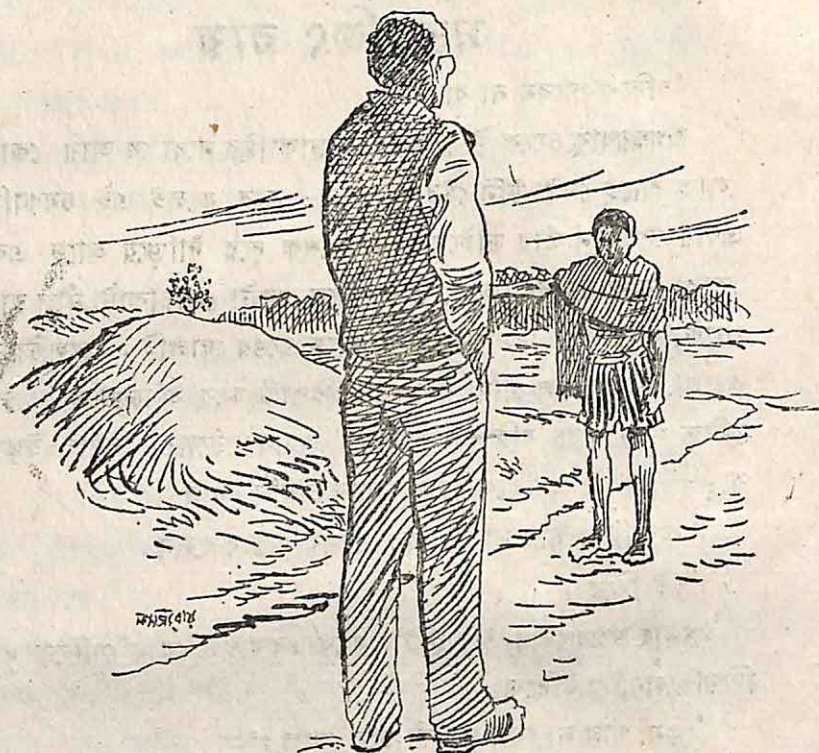
কাঁচা আর অজানা হয়। কাজেই না-দেখাটা আশ্চর্য নয়।

ছেলেটি এখনও সেই ভাবেই দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে দেখছে।

'কী নাম তোর?' জগন্ময়বাবু জিগ্যেস করলেন।

'ভগওয়ান।'

'ওরে ব্বাবা!—বাংলা শিখলি কোথায়?'

'ইস্কুলে।'

'আমার পিছন পিছন আসছিলি কেন?'

'আমার বাড়ি ওই ত।'

জগন্ময়বাবু দেখলেন যেদিকে ঢিবি সেইদিকেই আরো সিকি মাইলটাক দূরে বাঁশবনের লাগোয়া খাপ্‌রার ছাউনি দেওয়া কুটির।

জগন্ময়বাবু আবার চাইলেন ছেলেটির দিকে। আরো দু-একটা প্রশ্ন করতে হয়। সে ফস্ করে যেচে তাঁকে এভাবে নিষেধ করবে কেন ?

'গাছের কী নাম ?'

'জানি না।'

'বিষ আছে জানলি কী করে ?'

'মরে যায় যে।'

'কী মরে যায় ?'

'সাপ, ব্যাঙ, ইঁদুর···পাখি···'

'কী করে মরে যায় ? গাছে বসলে ? না ফুল খেলে ?'

'কাছে গেলে।'

'কাছে মানে ? কত কাছে ?'

'চার হাত। পাঁচ হাত।'

'তুই তো খুব গোপ্পে দেখছি! নাকি গাঁজা ধরেছিস এই বয়সেই ? তোর মাস্টারকে জিগ্যেস করিস ইস্কুলে। ফুলগাছে এরকম বিষ হয় না কখনো।'

ছেলেটি চুপ করে চেয়ে আছে।

'আমি এখানে নতুন লোক। চেঞ্জের জন্য এসেছি। আমার শরীর খারাপ, বুঝেচিস ? ওরকম গুল-টুল মারিস নি। এদেশে ওরকম ফুলের কথা কেউ শোনে নি। ওরকম হয় না।'

'এদেশের না। সাহেব এনেছিল।'

ছেলেটা দেখছি নাছোড়বান্দা। বিশ্বাস করাবার জন্য বদ্ধ পরিকর।

'কোন্ সাহেব ?'

'আপনি যে বাড়িতে আছেন, সেই বাড়িতে ছিল।'

'কবে এসেছিল ?'

'যেবার খরা হল তার আগেরবার।'

'কী নাম ?'

'নাম জানি না। লাল মুখ, কটা চুল।'

'সে এসে এই ঢিপির উপর পুঁতে দিয়ে গেছে গাছ?'

'জানি না।'

'তবে?'

'সাহেব যাবার পরেই গাছ হল, হোই যে বন, ওইখানে ঘুরত হাতে কাচ নিয়ে।'

বটানিস্ট-টটানিস্ট হবে, জগন্ময়বাবু ভাবলেন। ভারি তাজ্জব কথাবার্তা বলছে ছেলেটি।

'ওই দেখুন না।' ছেলেটি আবার আঙ্গুল দেখাল। 'ওই ঢিপিটার পাশে। ওই যে পাথরটা, তার ঠিক ডান পাশে।'

জগন্ময়বাবু দেখলেন। একটা সাদা সাদা কী যেন দেখা যাচ্ছে।

'কী ওটা?'

'সাপ।'

'সাপ?'

'সাপ ছিল। এখন হাড়। মরে গেছে। চিতি সাপ। বিষের দম ছাড়ে ওই ফুল।'

জগন্ময়বাবু বাইনোকুলারটা চোখে লাগালেন। হ্যাঁ, সাপই বটে। সাপের কঙ্কাল। ফুলটাও দেখলেন দূরবীনের ভিতর দিয়ে। যত সরল মনে হয়েছিল তত নয়। কোনো রঙটাই সরল নয়। হলুদের মধ্যে বেগুনীর ছিটে, বেগুনীর মধ্যে হলুদ, অরেঞ্জের মধ্যে সাদা আর কালো।

যন্ত্রটা চোখে লাগিয়ে আরো একটা মরা জিনিস দেখতে পেলেন জগন্ময়বাবু। এটাও সরীসৃপ, তবে এটার পা আছে চারটে। গিরগিটি বা বহুরূপী জাতীয় কিছু। এটা গত দু'একদিনের মধ্যে মরেছে।

'তা এরা সব অ্যাদ্দিনে সেয়ানা হয়ে যায় নি? এখনো আসে আর মরে?'

'রোজ মরে, একটা দুটো।'

'কই অত ত দেখছি না। মাত্র দুটো ত।'

'ঢিপির পিছনে আছে। বেশি মরলে পরে বাঁশ দিয়ে টেনে এনে সাফ করে দেয়।'

'কে?'

'আমার বাবা। আমিও!'

'তা বাঁশ দিয়ে গাছে ঘা মেরে ওটাকেও সাবাড় করে দিস না কেন? তাহলেই ত আপদ চুকে যায়।'

'আবার গজায়।'

'বলিস কী!'

'পুড়িয়ে দিলেও আবার গজায়।'

জগন্ময়বাবু ব্যাপারটাকে বেশি গুরুত্ব দিতে চাইছিলেন না। কারণ পাঁচ আনার বেশি বিশ্বাস হয় নি এখনো তাঁর মনে। যেটুকু হয়েছে তার কারণ একবার কোন্ বইয়ে যেন মাংসাশী গাছের কথা পড়েছিলেন। বিশ্ব-চরাচরে অনেক আশ্চর্য জিনিস আছে যার অনেকই এখনো হয়তো মানুষের অগোচরে রয়েছে।

'আরো আছে এই গাছ?'

'আছে।'

'কোথায়?'

'ওই বনে আছে।'

'কাছাকাছির মধ্যে এই একটাই?'

'আর দেখি নি বাবু।'

ব্যাপারটা যদি সত্যি হয় তাহলে বলতে হবে এখানে এসে সুদৃশ্য স্বাস্থ্যময় নিরিবিলি পরিবেশ আর টাট্‌কা সস্তা সুস্বাদু খাদ্য-দ্রব্য ছাড়াও একটা উপরি লাভ হয়েছে জগন্ময়বাবুর। এটার আশাই করেননি। ফিরে গিয়ে আপিসে বলার মত গল্প হল একটা। বিষ-ফুল! গাছের নিশ্বাসে বিষ! ওই দুটি মৃত প্রাণী না দেখলে ছেলেটির কথা তিনি আদৌ বিশ্বাস করতেন না। তবে সে এইভাবে বানিয়ে কথা বলবে কেন সেটাও একটা প্রশ্ন। এ ধরণের প্র্যাকটি-ক্যাল জোক একমাত্র শহরেই সম্ভব—আর তাও সে পয়লা এপ্রিলে।

গাঁয়ে দেশে যে এমন জিনিস হয় না সেটা চিরকাল শহরে বাস করেও বেশ বুঝতে পারলেন জগন্ময়বাবু। আর এটাও বুঝলেন যে তাঁর বিয়াল্লিশ বছরের জীবনে আজ একটি স্মরণীয় দিন। বিষফুলের কথা আজ তিনি প্রথম শুনলেন।

অথচ মজা এই যে কাঠঝুমরিতে আসার কথাই ছিল না তাঁর। গিয়েছিলেন ডালটনগঞ্জ, তাঁর বোনের বাড়িতে দিন পনের ছুটি কাটিয়ে আসবেন বলে। গত বছর থেকেই একটা হাঁপের কষ্ট অনুভব করতে শুরু করেছেন জগন্ময়বাবু। ডাক্তার—শুধু ডাক্তার কেন, চেনাশোনা সকলেই—বলেছেন ড্রাই ক্লাইমেটে ক'টা দিন কাটিয়ে আসার কথা।—'বিয়ে ত কর নি ; এত টাকা কার জন্য পুষে রাখছ ? একটু খরচ-টরচ করো। আমাদের পেছনে না করবে ত অন্তত নিজের পেছনেই কর !'—এই 'এত টাকা'র ব্যাপারটা জগন্ময়বাবুর মোটামুটি নিস্তরঙ্গ জীবনে একটা ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ মহাসামুদ্রিক ঢেউ-এর মতো। তিনদিন রেসের মাঠে যাবার পর চতুর্থ দিনই জ্যাকপট পেয়ে যান ভদ্রলোক। এক ধাক্কায় চৌষট্টি হাজার টাকা। অথচ ঘোড়া নিয়ে কোনোদিন মাথা ঘামান নি, রেসের বই-এর পাতা খুলে দেখেন নি ; যাওয়া কেবল এক বন্ধুর পাল্লায় পড়ে। এবং কিছুটা কৌতূহলবশত। ডাক্তার নন্দী বলেন হাঁপানির টানটা ওই টাকা পাওয়ার পর থেকেই ! তা হতে পারে। জগন্ময়বাবু নিজে লক্ষ করেছেন যে এই আকস্মিক ভাগ্য পরিবর্তনের ফলে তাঁর মধ্যে কিছু চারিত্রিক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। যেমন, তিনি সাধারণ অবস্থায় অনেক বেশি হাতখোলা ছিলেন ; এখন হিসেবী হয়ে পড়েছেন। গাড়ি কেনার সামর্থ্য হয়েছিল, কিনে-কিনেও কেনেন নি। বন্ধুদের ভোজ দেবেন বলে শেষ পর্যন্ত সন্দেশের উপর সেরেছেন। আদরের ভাইপো তিলুর জন্মদিনের জন্য চুয়াল্লিশ টাকা দামের রেলগাড়িটা দর করে পয়সা বার করার সময় মত বদলে সাতাশ টাকারটা কিনেছেন। শুকনো ক্লাইমেটে দিন পনের কাটিয়ে আসার পরিকল্পনাটা যখন মাথায় এল, তখন বন্ধুরা অনেকেই অমুক

জায়গায়, অমুক হোটেল, অমুক ট্যুরিষ্ট লজের কথা বলেছিল, সে সবই জগন্ময়বাবুর সামর্থ্যের মধ্যেই ছিল ; কিন্তু শেষ মুহূর্তে তিনি খরচ বাঁচিয়ে ডালটনগঞ্জে বোনের কাছে যাওয়াই স্থির করেন। সেখানেই থাকতেন পুরো ছুটিটা। কিন্তু দুই ভাগনের এক সঙ্গে চিকেন পক্স হয়ে যাওয়ায় ভগ্নীপতি নিজেই বললেন, 'একবার কাঠঝুমরিতে মূর সাহেবের বাংলোটার খোঁজ করে দেখুন না। বিলিতি টাইপের বাংলো, খাওয়া-দাওয়া সস্তা আর ভালো, চেঞ্জও হবে, বিশ্রামও হবে। অবিশ্যি সাহেব আর নেই—মাস চারেক হল মারা গেছেন। তবে গিন্নী আছেন। এখানেই থাকেন। ওঁরা ভাড়া দেন ওদের বাংলো এটা আমি জানি।'

বুড়ি মিসেস মূর কোনো আপত্তি তোলেন নি। তবু বলেছিলেন, 'এ দিকটা ত আমার স্বামীই দেখতেন।—ওঁর কয়েকজন বাঁধা খদ্দের ছিল।—তবে তাদের ত কোন চিঠি বা টেলিগ্রাম দেখছি না ; তোমায় দিতে আপত্তি নেই, তবে পনের দিনের বেশি তোমাকে থাকতে দিতে পারব না, ভেরি সরি।'

'তার প্রয়োজনও হবে না।'

তিন দিন ডালটনগঞ্জে থেকে এই সবে তিনদিন হল গত শুক্রবার জগন্ময়বাবু মূর সাহেবের বাংলোতে এসে উঠেছেন। আর এসেই বুঝেছেন যে তাঁর মত মানুষের পক্ষে ছুটি কাটানোর আর এর চেয়ে ভালো জায়গা হয় না। প্রথমতঃ ক্লাইমেট। এসে অবধি একদিনও নিশ্বাসের কষ্ট হয় নি। দ্বিতীয়তঃ, কলকাতার মানুষ জগন্ময় বারিক কল্পনাই করতে পারেন নি যে ট্রাম বাস লরি ট্যাক্সি রেডিও টেলিফোন টেলিভিশন সিনেমা মানুষের কোলাহল ইত্যাদি বাদ হয়ে গেলে কী আশ্চর্য টনিকের কাজ হয়। এখন বুঝতে পারছেন যে কলকাতার মানুষ সবসময়ই কোনঠাসা, সত্যি করে হাত পা ছড়ানো যে কাকে বলে সেটা তিনি বুঝেছেন কাঠঝুমরিতে এসে।

মূর সাহেবের বাংলো প্রথম দর্শনেই জগন্ময়বাবুর মনটা ভালো হয়ে গিয়েছিল। দূরে পিছনে পাহাড়ের লাইন, তারপর এগিয়ে এলে

প্রথমে বন, বনের পর অসমতল প্রান্তর—তার এখানে ওখানে ছড়ানো ছোট বড় টিলা, আর আরও এগিয়ে এলে লম্বা লম্বা গাছ পিছনে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে চিমনি আর টালির ছাতওয়ালা বিলিতি পোস্টকার্ডের ছবির মত মূর সাহেবের বাংলো। সেই বাংলোর বারান্দা পেরিয়ে ভিতরে ঢুকে ঘরগুলোর ছিমছাম চেহারা, আসবাবের পারিপাট্য, জানলা ও দরজার পর্দার নকশা ইত্যাদি দেখে জগন্ময়বাবুর বিশ্বাস হল যে রেসের মাঠে জ্যাকপট পাওয়ার চেয়ে ছুটি-ভোগের জন্য এমন বাংলো পাওয়া কিছু কম ভাগ্যের কথা না।

এখানে এসেই জগন্ময়বাবু তাঁর দিনের রুটিন ঠিক করে নিয়েছিলেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে চা খেয়ে হাঁটতে বেরোন, ফিরে এসে ব্রেকফাস্ট। তারপর বাংলোর বারান্দায় বা সামনের কম্পাউণ্ডে বসে ম্যাগাজিন পাঠ ; খান পঁচিশেক রীডারস ডাইজেস্ট নিয়ে এসেছেন তিনি বোনের বাড়ি থেকে, তারপর স্নান-খাওয়া সেরে দিবানিদ্রা। বিকেলে চায়ের পর আবার পদব্রজে ভ্রমণ। রাত্রে সাড়ে আটটার মধ্যে খাওয়া শেষ করে ঘুম।

আজ সকালে বেড়িয়ে ফিরে এসেই চৌকিদার বনোয়ারিকে জিগ্যেস করলেন বিষফুলের কথা। অবিশ্যি প্রথমেই ফুলের কথাটা না জিগ্যেস করে সেদিকে অগ্রসর হবার একটা রাস্তা তৈরি করে নিলেন।

'ভগওয়ান বলে কোনো ছেলেকে চেন ?'

'হাঁ বাবু। ভিখুয়াকা লড়কা।'

'ভিখুয়া কে ?

চৌকিদার বলল ভিখুয়া কাঠের মজুরি করে। চৌধুরীবাবুদের কাঠের গোলা আছে এই কাঠঝুমরিতেই, সেখানে কাজ করে।

'ভগওয়ানের বাড়ির দিকে রাস্তার ধারে একরকম ফুলের গাছ আছে। সে গাছ নাকি বাতাসে বিষ ছড়ায়।—জান ?'

'হাঁ বাবু।'

'কথাটা সত্যি ?'

'মর জাতা হ্যায় ··সাঁপ, চুহা, বিচ্ছু-উচ্ছু ··'

বনোয়ারি রুটি আর ডিমের অমলেট রেখে টি-পট আনতে গেল।

'এখানে এক সাহেব এসেছিল বছর তিনেক আগে ?' বনোয়ারি ফিরে এলে পর জিগ্যেস করলেন জগন্ময়বাবু। বনোয়ারি বলল সাহেব অনেক এসে থেকেছে এখানে। এককালে মূর সাহেব গিন্নীকে নিয়ে নিজেই আসতেন প্রতি শীতকালে। তিনবছর আগে কোনো সাহেব এসেছিল কিনা তা বনোয়ারির মনে নেই।

জগন্ময়বাবু ঠিক করলেন বিকেলে একবার বাজারের দিকে যাবেন। বাজার পান্নাহাটে–এখান থেকে মাইল দুয়েক। রেলস্টেশনও সেখানেই। এখানে আসতে হলে স্টেশন থেকে সাইকেল রিকৃশা নিতে হয়। পান্নাহাট থেকে ট্রেন ধরে সোজা ডালটনগঞ্জ যাওয়া যায়। প্রথমদিন এসেই জগন্ময়বাবু একবার বাজারের দিকে গিয়েছিলেন। দুজন বাঙালীর সঙ্গে আলাপ হয়েছে। পোস্টমাস্টার নুটবিহারী মজুমদার, আর পবিত্রবাবু বলে এক ভদ্রলোক, যিনি রয়েল হোটেলে উঠেছেন। মিঠে পানের খোঁজ করতে গিয়ে ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ। বললেন আগেও এসেছেন কাঠঝুমরি। মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভের কাজ করেন। রয়েল হোটেল নাকি নামেই হোটেল—'বলতে পারেন থ্রী-স্টার সরাইখানা।' মনে হল বেশ রসিক লোক। বয়স ত্রিশ পঁয়ত্রিশের বেশি না। 'আপনি উঠেছেন কোথায় ? কাঠঝুমরিতে ত থাকবার জায়গাই নেই। চৌধুরী কম্পানির কারুর সঙ্গে চেনা আছে বুঝি ?'

'আজ্ঞে না, আমি উঠেছি মূর সাহেবের বাংলোতে।'

'ও-ওই শিশু গাছে ঘেরা কটেজ বাড়িটা ?'

জগন্ময়বাবু বললেন যে, গাছে ঘেরা ঠিকই, তবে শিশু কিনা বলতে পারবেন না, দেখে ত বুড়ো বলেই মনে হয়—হে—হে।— 'আমি মশাই সেণ্ট পার্সেণ্ট শহুরে। বড় জোর আম জাম কলা নারকেল আর বট-অশ্বত্থটা চিনতে পারি—তার বাইরে জিগ্যেস করলেই মুশকিল।'

এই পবিত্রবাবু আর নুটবিহারীকে আজ একবার জিগ্যেস করে দেখতে হবে। চৌকিদারের কনফারমেশন যথেষ্ট নয়। আসলে জগন্ময়বাবু কলকাতায় গিয়ে এই বিষফুলের বিষয় কিছু লিখতে চান। এখনো পর্যন্ত কেউ লেখেনি। এই একটা ব্যাপারে পায়োনিয়ার হবেন তিনি।

নুটবিহারীবাবুকে জিগ্যেস করে বিশেষ ফল হল না। বললেন, 'আমি মশাই সবে লাস্ট ইয়ারে বদলি হয়ে এখানে এসিচি। স্থানীয় সংবাদ বিশেষ আমার কাছে পাবেন না। আপনি বরং আর কাউকে জিগ্যেস করুন।'

পোস্টাপিস থেকে জগন্ময়বাবু গেলেন বাজারের দিকে। পান কেনা আছে, আর যদি একটা এক্সারসাইজ বুক পাওয়া যায় ত কাজের কাজ হবে। লেখার জন্য তৈরি হতে হবে ত। কলম আছে সঙ্গে, খাতা আনেন নি।

পবিত্রবাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল একটা চায়ের দোকানের সামনে। বেঞ্চিতে বসে বাংলা খবরের কাগজ পড়ছেন। বললেন, 'আসুন, চা খান। ওহে ভরদ্বাজ—দু কাপ—একের জায়গায় দুই।'

জগন্ময়বাবু সোজা আসল প্রশ্নে চলে গেলেন।

'আপনি বিষফুলের নাম শুনেছেন?'

পবিত্রবাবু কাগজটা ভাঁজ করে জগন্ময়বাবুর দিকে চোখ তুললেন। 'হলদে কমলা বেগনী? তালহার যাবার পথে ডানদিকে রয়েছে ত? একটা ঢিবির ওপরে?'

'আপনি ত সব জানেন দেখছি!'

'বললুম ত—চারবার ঘুরে গেছি এখানে। বছর দুই থেকে দেখছি ওটা। প্রথম যেদিন দেখি সেদিন ঢিবির পাশে একটা আস্ত শুয়োর-ছানা মরে পড়েছিল।'

'বলেন কী! তা এই নিয়ে আপনি কাউকে বলেন নি কিছু? আপনি ত কলকাতার লোক—কাগজে-টাগজে—?'

পবিত্রবাবু উড়িয়ে দিলেন। 'বলবার কী আছে মশাই? প্রকৃতির

খামখেয়াল কত রকম হয় সব নিয়ে কি আর কাগজে লেখে? আরো কত হাজার রকম বিষফুল বিষফল বিষপোকা বিষপাখি রয়েছে পৃথিবীতে কে জানে। আরে মশাই, কলকাতাতে বাস, সেখানে হাওয়াটাই বিষাক্ত। প্রতি নিশ্বাসে পাঁচ সেকেণ্ড করে আয়ু কমে যাচ্ছে—সেদিন দেখলুম কোথায় জানি লিখেছে। সেখানে ফুলের বিষ নিয়ে কে মাথা ঘামাতে যাচ্ছে মশাই?'

'কিন্তু এখানকার লোক···এদের পক্ষে ত এটা একটা ডেঞ্জার মশাই?'

'কাছে না ঘেঁষলেই হল। পাঁচ সাত হাত দূরে থাকলেই ত সেফ। সেকথা এখানে সবাই জানে।'···

জগন্ময়বাবু চা খেয়েই উঠে পড়লেন। অক্টোবরের মাঝামাঝি; সূয্যি ডুবলেই ঝপ্ করে ঠাণ্ডা পড়ে। সর্দি-গর্মির রিস্ক্টা না নেওয়াই ভাল।

চায়ের দোকানের পাশেই একটা মনিহারি দোকান থেকে খাতা কিনে ভদ্রলোক যখন বাড়ি ফিরলেন তখন সোয়া ছটা। মনে বেশ একটা উত্তেজনা অনুভব করছেন তিনি। পাকা কনফারমেশন পাওয়া গেছে, এবার উনি স্বচ্ছন্দে লিখতে পারেন। লেখাটা কোনো উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে একটা বড় কাজ হবে। কাঠঝুমুরির নামটাও লোকের জানা উচিত। টুরিস্ট ডিপার্টমেণ্ট জানে কি নামটা? মনে ত হয় না।

লেখার অভ্যেস নেই তাই খাতা খুলে হাতের কলমটার উপর থুতনিটা ভর করে আধঘণ্টা বসে থেকেও কোনো ফল হল না। এত চট্ করে হবে না। হাতে আরো দশ দিন সময় আছে। ধীরে সুস্থে ভেবেচিন্তে লিখতে হবে। বিষফুল···। নামটা দুবার আপন মনে উচ্চারণ করলেন জগন্ময়বাবু। বিষফুল ··! এই নামের লেখা লোকে না পড়ে পারবে না।

[দুই]

আজ আর বাইনোকুলারের দরকার হল না। সকাল সাতটার সময় টিবিটার কাছে পৌঁছে রাস্তা থেকে খালি চোখেই জগন্ময়বাবু যে

মৃত প্রাণীটা দেখতে পেলেন সেটা হল একটা খরগোশ। মরা সাপের কঙ্কাল আর মরা গিরগিটিও এখনো রয়েছে। মৃতের সংখ্যা আরো বাড়লে হয়ত জায়গাটা পরিষ্কার করবে এসে ভগওয়ান বা ভগওয়ানের বাপ।

জগন্ময়বাবু হিসেব করতে চেষ্টা করলেন গাছটা কত দূর হবে রাস্তা থেকে। বিশ হাত? পঁচিশ হাত? তাঁর একটা অদম্য ইচ্ছে হচ্ছে একটু এগিয়ে গিয়ে গাছটাকে আরেকটু ভালো করে দেখার। পাঁচ হাতের বেশি কাছে না গেলেই ত হল।

কিন্তু ওই ছোকরার অনুমান যদি ভুল হয়?

যদি সাত হাত, আট হাত দূর পর্যন্ত ফুলের প্রভাব পৌঁছায়?

জগন্ময়বাবু ঘাসের উপর দিয়ে তিন পা এগিয়ে আবার পেছিয়ে এলেন। সাপ, খরগোশ, গিরগিটি। শুয়োর। পোকামাকড়ের কথা ছেলেটি বলে নি। ফড়িং পিঁপড়ে মশামাছি—এ সবই কি এই গাছের বিষে মরে? না ছোট জিনিস রেহাই পায়? আর বড় জিনিস? তাঁর লেখার জন্য এগুলো জানা দরকার। আজ ছেলেটিকে দেখছেন না। একবার তার বাড়ি যাবেন নাকি? একটা ইণ্টারভিউ করবেন তাকে—যেমন অনেককে খবরের কাগজে করে?

প্রশ্নটা মাথায় আসতেই মনে হল—তাড়া নেই, সব হবে। ধীরে সুস্থে, ধীরে সুস্থে। হাতে আরো সাতদিন সময়।

এখানে জলটা ভালো, তাই খিদে হয় প্রচুর। ব্রেকফাস্টের কথা চিন্তা করতে করতে জগন্ময়বাবু বাড়ি ফিরলেন। বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা বিশাল কম্পাউণ্ড। দুটো কাঠের গেট, একটা পশ্চিমে, একটা উত্তরে।

উত্তরের গেটে—যেটা দিয়ে জগন্ময়বাবু এখন ঢুকলেন—এখনো একটা কাঠের ফলকে মূর সাহেবের নাম রয়েছে। গেট থেকে সোজা রাস্তা গিয়ে কটেজের সামনের বারান্দায় শেষ হয়েছে। বড় বড় গাছগুলো, যেগুলোকে পবিত্রবাবু শিশু বললেন, সেগুলো কটেজের পিছনদিকে। এদিকে দক্ষিণে যে দুটো বড় গাছ রয়েছে সেগুলো

শিশু নয় নিশ্চয়ই, কিন্তু সেগুলোর নামও জগন্ময়বাবু জানেন না। এর মধ্যে যেটা দূরের গাছ, সেটার ডালপালাগুলো প্রায় সাদা আর বেশ ছড়ানো। গুঁড়িটা কালো হলে হয়ত আরো সহজে চোখে পড়ত, কিন্তু সাদা হওয়া সত্ত্বেও, খুব বেশি দূরে নয় বলে গুঁড়ির পাশের চেনা গাছটা জগন্ময়বাবুর দৃষ্টি এড়াল না।

সেই একই গাছ, একই বিচিত্র ফুল।

বিষফুল!

জগন্ময়বাবুর পেট থেকে খিদেটা ম্যাজিকের মত উবে গেল।

এ গাছ কাল ওখানে ছিল না। জগন্ময়বাবু ওই সাদা গুঁড়িটা থেকে হাত দশেক দূরে বনোয়ারিকে দিয়ে ডেক চেয়ারটা আনিয়ে তাতে বসে রোদ পোহাচ্ছিলেন। তখন তাঁর কোন কাজ ছিল না, কেবল শরৎকালের মিঠে রোদটা উপভোগ করা। তাঁর চোখ তখন চতুর্দিকে ঘুরছে, এমন কি সাদা গুঁড়িটার দিকেও। এটা মনে আছে, কারণ জগন্ময়বাবুর তখন মনে হয়েছিল গুঁড়িটার রঙের সঙ্গে ইউক্যালিপটাসের গায়ের রঙের মিল আছে। ওই আরেকটা গাছ ওঁর চেনা। ইউক্যালিপ—

ওটা কী?

একটা পাখি।

খয়েরি রং-মাথা থেকে ল্যাজের ডগা অবধি। শালিকের চেয়ে ছোট। পাখিটা মাটিতে খুঁটে খুঁটে কী জানি খাচ্ছে, আর মাঝে মাঝে খাওয়া থামিয়ে মাথা তুলে চিড়িক চিড়িক ডাকছে। ওই ফুলগাছটার হাত দশেকের মধ্যে। এবার দুটো ছোট্ট লাফ মেরে পাখিটা ফুলগাছটার দিকে আরো এগিয়ে গেল। জগন্ময়বাবু আর অপেক্ষা না করে সজোরে দুটো তালি মারলেন। পাখিটা তীক্ষ্ণ শিস দিতে দিতে উড়ে পালিয়ে গেল। জগন্ময়বাবু হাঁপ ছাড়লেন। কিন্তু গাছটা ত রয়ে গেল।

ওটার একটা ব্যবস্থা করা যায় না? সামনে রাস্তায় অনেক ঢেলা পড়ে আছে। একটা ঢেলা হাতে তুলে নিয়ে জগন্ময়বাবু গাছটাকে

তাক করে নিক্ষেপ করলেন। গাছটা থরথরিয়ে কেঁপে উঠল। লেগেছে! কিন্তু কোনো ফল হবে কি একটা ঢিলে?

জগন্ময়বাবু অনুভব করলেন যে তাঁর মাথায় খুন চেপেছে। পর পর ত্রিশটা ঢেলা মারলেন গাছটার দিকে। কোনদিন ক্রিকেট খেলেন নি, তাই বোধহয় অর্ধেক ঢেলা পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল; কিন্তু বাকিগুলো লাগল। গাছটা নুয়ে পড়েছে।

'উয়ো ফির খাড়া হো যায়গা বাবু।'

ভগওয়ান। গেটের বাইরে বই হাতে দাঁড়িয়ে দেখছে, মুখে মৃদু হাসি!

'হোক্ গে খাড়া,' বললেন জগন্ময়বাবু। 'কিছুক্ষণের জন্য নিশ্চিন্ত।' ভগওয়ান চলে গেল।

ঘটনাটা যে চৌকিদার আর মালিও দেখেছে সেটা বাংলোর দিকে মুখ ঘুরিয়ে বুঝলেন জগন্ময়বাবু। বোঝাই যাচ্ছে দুটোই অকর্মার ঢেঁকি। তাঁকে একটু হেল্‌প করতে পারল না এগিয়ে এসে?

ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে মনে হল যে চৌকিদার আর মালির এই যে নিস্পৃহ ভাব, তার জন্য হয়ত উনি নিজেই কিছুটা দায়ী। এখানে এসেই বোধহয় ওদের দুজনের হাতে কিছু আগাম বকশিশ গুঁজে দেওয়া উচিত ছিল। মালি ত স্টেশনে গিয়েছিল ওকে আনতে। মিসেস মূর টেলিগ্রামে খবর পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কুলির বদলে উনি মালির পিঠেই মাল চাপিয়েছিলেন। একটা সুটকেস, একটা বেডিং, একটা বড় কল লাগানো ফ্লাস্ক। নিজের হাতে নিয়েছিলেন কেবল ছাতা আর বোনের দেওয়া এক হাঁড়ি মিষ্টি। বাংলোয় পৌঁছে উনি মালির জন্য দুটো টাকা বার করেও আবার পকেটে রেখে দিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন—'যাবার দিন পুষিয়ে দেব; আগে দেখি না ব্যাটারা কিরকম কাজ করে।'

কাজ অবিশ্যি ভালোই করছে দুজনে। কিন্তু কাজের বাইরে আগ বাড়িয়ে এসে দুটো কথা বলা, কী চাই না-চাই, কোনো অসুবিধা হচ্ছে কি না, এসব জিজ্ঞেস করা—এটা দুজনের একজনও

করে নি। কাঠঝুমরির এই একটি ব্যাপারই জগন্ময়বাবুর কাছে 'লেস দ্যান পারফেক্ট' বলে মনে হয়েছিল। এখন বুঝছেন দোষটা খানিকটা ওঁর নিজেরই।

'এই বাড়ির আশেপাশে ওই গাছ আরো আছে নাকি?'—চায়ে চিনি নাড়তে নাড়তে চৌকিদারকে জিজ্ঞেস করলেন জগন্ময়বাবু। চৌকিদার বলল বাংলোর চৌহদ্দির মধ্যে ওই গাছ ও আজই এই প্রথম দেখল।

'একি রাতারাতি গজিয়ে যায় নাকি?'
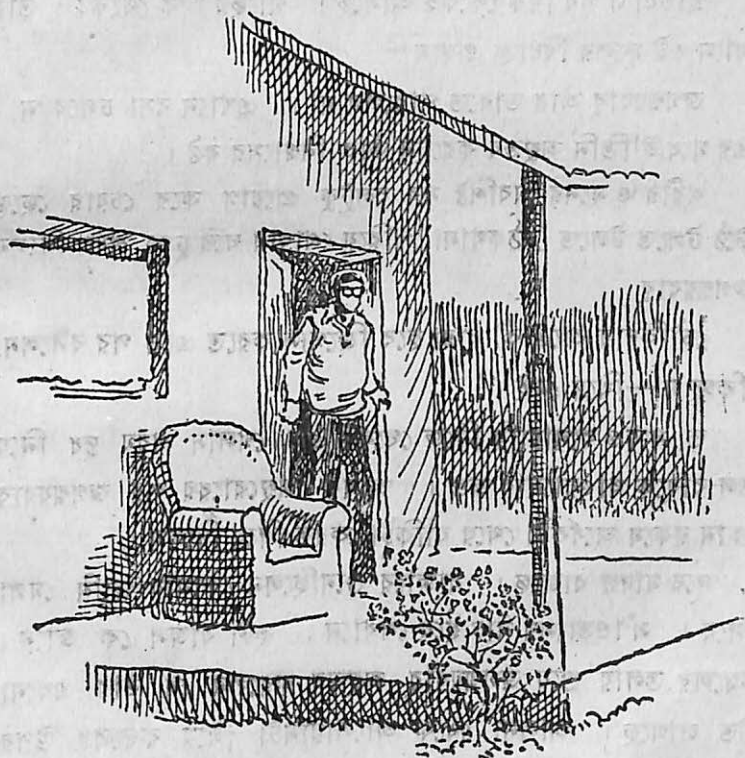
'ওইসাই তো মালুম হোতা বাবু।'

'একটু খেয়াল রেখ ত। দেখলে আমায় বলবে।'

বনোয়ারি বলার আগেই জগন্ময়বাবুর চোখে পড়ল। বিকেলে ঘুম থেকে উঠে বারান্দায় বেরিয়ে এসেই।

বারান্দার পূব কোণার পিছন থেকে উঁকি দিচ্ছে এক গোছা চেনা ফুল। ঝিরঝিরে বাতাসে দুলছে ফুলগুলো। হাত পনেরর বেশি দূরে নয়।

জগন্ময়বাবু বুঝতে পারলেন তাঁর পা দুটো কেমন যেন অবশ হয়ে আসছে। কোনো মতে এক পা পাশে সরে গিয়ে ধপ্ করে বসে পড়লেন বেতের চেয়ারের উপর। একবার মালি বলে ডাকতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোল না। গলা শুকিয়ে গেছে। মাথা ঝিমঝিম করছে। হাত-পা ঠাণ্ডা।

হাওয়াটা পূব দিক থেকেই আসছে। গাছের দিক থেকেই। তার মানে ওই ফুলের বিষাক্ত প্রশ্বাস—

জগন্ময়বাবু আর ভাবতে পারলেন না। এখানে বসা চলবে না। এর মধ্যেই তিনি অনুভব করছেন তাঁর নিশ্বাসের কষ্ট।

শরীর ও মনের অবশিষ্ট সব বলটুকু প্রয়োগ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে টলতে টলতে বৈঠকখানা পেরিয়ে শোবার ঘরে ঢুকে শয্যা নিলেন জগন্ময়বাবু

চৌকিদার রাত্রে কী রান্না হবে জিগ্যেস করতে এলে পর বললেন, 'কিচ্ছু না—খিদে নেই।'

তা সত্ত্বেও বনোয়ারি নিজে থেকেই এক গেলাস গরম দুধ নিয়ে এল বাবুকে খাওয়ানোর জন্য। অনেক অনুরোধের পর জগন্ময়বাবু কোন রকমে অর্ধেকটা খেয়ে বাকিটা ফেরত দিয়ে দিলেন।

দূরে মাদল বাজছে। বাজারে শুনেছিলেন কোথায় জানি মেলা বসবে। সাঁওতালের নাচ হবে সেখানে। কটা বাজল কে জানে। কম্বলের তলায় শুয়ে জগন্ময়বাবু অনুভব করলেন যে তাঁর এখনো শীত লাগছে। আলনা থেকে আলোয়ানটা নিয়ে কম্বলের উপর চাপিয়ে দিতে খানিকটা কাজ হল। তার ফলেই বোধহয় একটা সময় জগন্ময়বাবু বুঝলেন তাঁর চোখের পাতা দুটো এক হয়ে আসছে।

এর আগের ক'দিন এক ঘুমে রাত কাবার হয়েছে। আজ হল না। চোখ খুলতে ঘরে আলো দেখে প্রথমে খট্‌কা লেগেছিল, তারপর মনে

পড়ল নিজেই বনোয়ারিকে বলেছিলেন আজ ঘরে লণ্ঠনটা জ্বালিয়ে রাখতে। এখনো শীত। হাওয়াটা ওই বাইরের দিকের জানালাটা দিয়েই আসছে বোধহয়। কিন্তু ওটা ত বন্ধ করেছিলেন উনি শোবার আগে। কেউ খুলল নাকি ?

জগন্ময়বাবু ঘাড় তুললেন দেখবার জন্য।

জানালার পাশেই ড্রেসিং টেবিল। তার উপরেই রাখা লণ্ঠনের আলো পড়েছে তার পাল্লায়।

শুধু পাল্লায় না ; বাইরে থেকে যে জিনিসটা উঁকি মারছে, তার উপরেও। সেই আলোতেই চেনা যাচ্ছে জিনিসটাকে।

এ সেই একই গাছ। একই গাছ, একই ফুল। হলদে বেগুনী কমলা।

বিষফুল !

জগন্ময়বাবু বুঝতে পারলেন, তাঁর তলপেট থেকে যে আর্তনাদটা কণ্ঠনালী বেয়ে উপরের দিকে উঠে আসছে. সেটা মুখ দিয়ে বেরোনর সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সংজ্ঞা হারাবেন।

আর হলও তাই।

* * *

কামরাটা খালি পেয়ে জগন্ময় বারিক একটু নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। কারণ লোকের সান্নিধ্য এখন তাঁর ভাল লাগছে না। কাঠঝুমরিতে এমন স্বপ্নের মত সুন্দর প্রথম তিনটি দিন গত দু-দিনে কী করে এমন বিভীষিকায় পরিণত হতে পারে, সেই নিয়ে তিনি এই সাত ঘণ্টার জার্নির মধ্যে একটু চুপচাপ একা বসে ভাবতে চেয়েছিলেন। কিন্তু গার্ডের হুইসলের সঙ্গে সঙ্গে একটি চেনা লোক তাঁর কামরায় এসে উঠলেন। পান্নাহাটের পোস্টমাস্টার নুটবিহারী মজুমদার। ভদ্রলোকের সঙ্গে সেদিনের পর আর দেখা হয় নি।

'সে কি মশাই! এর মধ্যেই ফিরে চললেন নাকি ? নাকি আপনিও বেতোল যাচ্ছেন ?'

'বেতোল ?'

'এর পরের স্টেশন। মেলা বসেছে সেখানে। গিন্নীর হুকুমে সওদা করতে যাচ্ছি।'

'ও।'

'আপনি কোথায় চললেন?'

'ডালটনগঞ্জ।'

'শরীর খারাপ হল নাকি? এই দুদিনেই এত পুল্‌ড ডাউন···?

'হাঁ···একটু ইয়ে···'

নুটবিহারীবাবু মাথা নেড়ে একটু ফিক্ করে হেসে বললেন, 'যাক, ভদ্রলোকের লাক্‌টা ভালো।'

'লাক্?'

'পবিত্রবাবুর কথা বলছি।'

'কেন?'

'আরে, উনি ত আজ দশ বছর হল বছরে দুবার করে মূর সাহেবের বাংলোতে এসে থাকেন। ওটা এক রকম ওঁর মোনোপলি। অক্টোবর আর মার্চ। লিখতে আসেন। বড় রাইটার ত। পবিত্র ভট্টাচার্যি—নাম শোনেন নি? লেখেন, আর ভগবান বলে একটা কাঠুরের ছেলেকে বাংলা শেখান। শখের মাস্টারি! একটু আদর্শবাদী প্যাটার্নের লোক আর কি। আপনি গেচেন শুনে নেচে উঠবেন। ভারি আক্ষেপ করছিলেন নিজের ডেরা ছেড়ে হোটেলে থাকতে হচ্ছে বলে। বললেন বুড়ো মূর বেঁচে থাকলে এ গোলমাল হত না, বুড়িই গণ্ডগোলটা করেছে।'

* * *

বেতোল স্টেশনে নুটবিহারী নেমে যাবার পর গাড়িটা ছাড়বার ঠিক মুখে জগন্ময়বাবু দেখলেন প্ল্যাটফর্মের ধারে লোহার রেলিং-এর পিছনে ফুলের ঝাড়টা। একটা আধটা নয়, এক মাঠ জুড়ে কমপক্ষে একশোটা।

আর তারই মধ্যে নিশ্চিন্ত মনে খেলা করছে তিনটি ছাগলছানা!

———

পার্বতীপুরের রাজকুমার

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

পার্বতীপুর স্টেশনে নেমেই সুজয়ের গাটা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল। দুচোখের কোণ জ্বালা করতে লাগলো একটু একটু, আঙুলের ডগাও ভোঁতাভোঁতা লাগলো। জুন মাসের দুপুর, গনগন করছে রোদ, তাও সুজয়ের হঠাৎ শীত লাগলো। জ্বর আসবার সময়ে এই রকম হয়।

স্টেশনটা ছোটখাট, অতি সাধারণ। বাবা ট্রেন থেকে মালপত্র নামাচ্ছেন, মা আর দিদি একপাশে দাঁড়িয়ে বাক্স প্যাঁটরা গুনছে। সুজয় একটু দূরে সরে গেল। ধ্যুৎ, বেড়াতে এসে জ্বর হবার কোনো মানে হয়, মা টের পেলেই বিছানায় শুইয়ে রাখবেন।

কুলির মাথায় মালপত্র চাপিয়ে ওরা উঠলো ওভারব্রীজে। মাঝামাঝি আসবার পর সুজয়ের মনে হলো ব্রীজটা কোথায় যেন ভাঙা। তক্ষুনি কুলিটি বললো, 'দেখবেন বাবু, সাবধান, সামনে দুটো কাঠ ভাঙা আছে।' সুজয় অবাক হয়ে গেল—ঐ কথাটা হঠাৎ তার মনে হল কেন? সে তো ভাঙা জায়গাটা দেখতে পায়নি। দুখানা তক্তা নেই সেখানে, কেউ অন্যমনস্ক থাকলে গলে নিচে পড়ে যেতে পারে।

স্টেশনের বাইরে একটিমাত্র নীল রঙের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, আর কয়েকখানা সাইকেল রিক্সা।

বাবা বললেন, 'ঐ যে আমাদের জন্য গাড়ি পাঠিয়েছে।'

বাবার বন্ধু রঞ্জিতকাকুর মামাবাড়ি পার্বতীপুরে। রঞ্জিতকাকুর মামারা একসময়ে এখানকার জমিদার ছিলেন। এখন তো আর জমিদারি নেই, কিন্তু সেই আমলের একটা প্রকাণ্ড বাড়ি আছে।

বড়বড় তুটো দীঘি আর ফলের বাগান আছে। রঞ্জিতকাকু প্রায়ই পার্বতীপুরের এই বাড়ির গল্প করতেন তাই বাবা একদিন বলেছিলেন, 'ব্যবস্থা করে দাও না, আমরা ওখানে কিছুদিন থেকে আসি।'

রঞ্জিতকাকু বলেছিলেন, 'কোনোই অসুবিধে নেই।' তাঁর এক মামা এখনো সেখানেই থাকেন। অন্য মামারা থাকেন কলকাতায়, গ্রামে আর আসতে চান না। কিন্তু তাঁর মেজমামা এখানেই থাকতে ভালোবাসেন। তিনিই এ বাড়ির দেখাশুনো করেন।

রঞ্জিতকাকু তাঁর মেজমামাকে চিঠি লিখে সব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তিনি নিজেও সঙ্গে আসবেন ঠিক করেছিলেন, কিন্তু শেষমুহূর্তে আটকে গেছেন কাজে!

একটা মস্ত বড় গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে নীল রঙের গাড়িটা। সুজয় বেশীর ভাগ গাছই চেনে না, কিন্তু এটা যে অশ্বত্থ গাছ তা সে চিনতে পেরেছে। পার্বতীপুর স্টেশনের বাইরে এরকম একটা গাছ থাকবে তাও যেন সে জানতো!

সুজয়ের একই সঙ্গে শীতও করছে, গরমও লাগছে।

গাড়ী থেকে একজন লম্বা, শুকনো চেহারার লোক নেমে বিনীত-ভাবে হাতজোড় করে বলল, 'মেজবাবু নিজে আসতে পারেন নি। আপনাদের ট্রেনে আসতে কোনোরকম অসুবিধে হয়নি তো? দয়া করে গাড়িতে উঠে বসুন।'

লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে সুজয়ের মনে হলো লোকটা মিথ্যে কথা বলছে!

গাড়িটা স্টার্ট নেবার সময় প্রচুর শব্দ করলো। এমন ফটফট তুমদাম শব্দ যেন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। কয়েকটা বাচ্চা ছেলে গাড়িটার গায় হাত বুলোচ্ছিল, তারা ঐ শব্দ শুনে দূরে সরে গেল ভয়ে।

একটু খানি পাকা রাস্তার পরই গাড়িটা নেমে পড়লো মাঠের মধ্যে। সেইখান দিয়েই চলতে লাগলো ধুমধামের সঙ্গে। গাড়িটা লাফাচ্ছে যেন ঘোড়ার মতন।

ড্রাইভার মুখ ফিরিয়ে বলল, 'গতবছর বন্যায় এদিককার রাস্তা সব ভেঙে গেছে তো। গাড়ি চালাবার উপায় নেই।'

বাবা বললেন, 'তাহলে গাড়ি আনলেন কেন? আমরা কুলির মাথায় মালপত্র চাপিয়ে না হয় হেঁটেই যেতুম। বেশী দূর তো নয়'।

ড্রাইভার বলল, 'না বেশী দূর নয়, এই মাত্র মাইল পাঁচেক।' বাবা বললেন, 'অ্যাঁ? রঞ্জিত যে বলেছিল স্টেশনের কাছেই বাড়ি!' ড্রাইভার বলল, হ্যাঁ, আগে খুব কাছে ছিল, এখন যে রেল স্টেশনটা দূরে সরে গেছে!'

সুজয় বসে আছে ড্রাইভারের পাশে, তার এসব কোনো কথাই বিশ্বাস হচ্ছে না।

মিনিট দশেক যাবার পরেই গাড়িটা ক্যাকর কোঁ ভুররর-ভট্ শব্দ করে একেবারে থেমে গেল। ড্রাইভার নেমে গিয়ে, বনেট খুলে খুটখাট আরম্ভ করল।

মা বাবার দিকে ফিরে বললেন, 'আমি বলেছিলুম পুরী যেতে। শুনলে নাতো আমার কথা!'

ড্রাইভার উঁকি মেরে বলল, 'উপায় নেই, ঠেলতে হবে।' সবাই নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। রোদ একেবারে ঝাঁঝাঁ করছে, তবে গত কালই বোধহয় বৃষ্টি হয়েছিল, মাঠের এখানে সেখানে জল জমে আছে। মা তো কাদার মধ্যেই পা দিয়ে ফেললেন। ড্রাইভার বলল, 'সাবধান, দেখবেন, এখানে বড্ড সাপ খোপের উপদ্রব, কালই একজনকে সাপে কেটেছে।'

দিদি তাই শুনে এক লাফ দিল।

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, 'সাপে কেটেছে মানে সাপে কামড়েছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কোথায়? এই মাঠে?'

'মাঠে তো সাপের কামড়ে প্রায়ই এক আধজন মরে। কাল একজন মরেছে আমাদের রাজবাড়িতেই।'

মা বললেন, 'স্টেশনটা তো বেশী কাছে। ফিরে গেলে হয় না?'

বাবা বললেন, 'আহা, আগেই অত ভয় পাচ্ছ কেন ?'

মাঠের সামনে একটা উঁচু বাঁধ। গাড়িটা অনেক কষ্টে ঠেলে তোলা হলো ওপরে। সবাই দারুণভাবে হাঁপাতে লাগল। সুজয়ের শরীরটা কাঁপছে। ঠিক ম্যালেরিয়া রুগীর মত।

ড্রাইভার বলল, 'এইবার উঠে বসুন, আর চিন্তা নেই।'

গাড়ি চলতে শুরু করল আবার। সুজয়ের মনে হলো গাড়িটা আসলে খারাপ হয় নি। লোকটি ইচ্ছে করে ঠেলালো ওদের দিয়ে। মাঠটা পার করে দিল এই ভাবে।

বাঁধের ওপরে বেশ ভালো রাস্তা। একটু বাদেই সেটা গিয়ে মিশেছে পাকা রাস্তায়। তারপর আবার মিনিট দশেক চলার পর একটা মোড় এলো। রাস্তার মাঝখানটা গোল করে বাঁধানো। তার সামনে, বাঁদিকে আর ডানদিকে তিনটে রাস্তা বেরিয়ে গেছে। গাড়িটা বাঁ দিকে বেঁকতেই সুজয় বলে উঠলো, 'ডান দিকে।' মা, বাবা, দিদি সবাই তার দিকে তাকালো। ড্রাইভারও ঘচ করে ব্রেক কষে সুজয়ের দিকে চেয়ে রইলো।

সুজয় দৃঢ়ভাবে বললো, 'এবারে ডানদিকে যেতে হবে।'

ড্রাইভারটি কাঁচুমাচু ভাবে বললো, 'হ্যাঁ, আমারই ভুল হয়ে গেছে। এদিকে তো বেশি আসা হয় না !'

পেছনের সীট থেকে দিদি মুখ ঝুঁকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুই কী করে জানলি রে ?'

সুজয় কোনো উত্তর দিল না। দিদি তার ঘাড় ছুঁয়েছে। কিন্তু চমকে উঠলো না তো ! সুজয়ের তো এখন জ্বরে গা পুড়ে যাবার কথা। তবে কি তার জ্বর হয় নি ?

রাস্তাটা আবার ডান দিকে বাঁক নিয়েছে। সেখানে মোড় ফেরবার আগেই সুজয় আবার বলে উঠলো, 'আমরা এসে গেছি।' বাবা বললেন, 'যাঃ, পাঁচ মাইল দূর বলল যে।' ড্রাইভার এবার রীতিমতন ভয়ে ভয়ে সুজয়ের দিকে চোরা চাহনি দিল।

গাড়িটা ডানদিকে ঘোরার একটু পরেই দেখা গেল গাছপালার

আড়ালে একটা বিশাল বাড়ি। জমিদার বাড়িকে গ্রামের লোক রাজবাড়ি বলে। সত্যি রাজবাড়ির মতন দেখতে। সামনে প্রকাণ্ড লোহার গেট, দুপাশে দুটি গম্বুজ। গেটের পর সুরকি বিছানো পথ, তার দুদিকে নানারকম ফুলের গাছ আর পাথরের পরী। তারপর বাড়িটা যেন দুর্গের মতন।

গেট দিয়ে গাড়িটা ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সুজয় বলল, 'বাবা এই বাড়িতে আমি আগে এসেছি।'

বাবা বললেন, 'সে কি? তুই কী করে আগে আসবি এখানে? আমি নিজেই কখনো আসিনি।'

সুজয় বলল, 'এই জায়গাটা আমার খুব চেনা। এই বাড়িটাও।'

দিদি বলল, 'এরকম অনেক বাড়ি ছবিতে দেখা যায়। দেখলেই মনে হয় চেনা চেনা।'

সুজয় বলল, 'না, সেরকম নয়, এই জায়গায় আমি আগে এসেছি।'

মা বললেন, 'আমরা কেউ আসিনি। তুই কী একা এসেছিস?'

গাড়িটা এসে থামলো বাড়ির সামনে। থাক থাক সিঁড়ি উঠে গেছে। তারপর পেতলের বল্টু লাগানো একটা মস্ত বড় কাঠের দরজা। গাড়ির আওয়াজ পেয়েও কেউ বাইরে বেরিয়ে এল না।

ড্রাইভারটি সুজয়ের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে রইল। সুজয় বলল, 'কী হলো, কাউকে দরজা খুলতে বলুন!' সে চমকে গিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।' তারপর সে তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গিয়ে ধাক্কা দিল দরজায়। বেশ কয়েকবার ধাক্কা দেবার পর দরজা খুলে একজন লাঠিয়াল বেরিয়ে এল।

বাবা বললেন, 'আশ্চর্য তো! লাঠিয়াল বাইরে পাহারা দেবার বদলে দরজা বন্ধ করে ভেতরে বসে আছে!'

লোকটাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মেজবাবু কোথায়?'

লোকটি বাবার দিকে চেয়ে রইল, কোনো উত্তর দিল না।

সুজয় বলল, 'এই লোকটি বোবা!'

ড্রাইভার প্রায় আঁতকে উঠলো সুজয়ের কথা শুনে, ফ্যাকাসে মুখে বলল, 'আপনি কী করে জানলেন?'

এবারে মা আর বাবা খুব অবাক হয়েছেন। দিদি বলল, 'সত্যি?'

ড্রাইভার বলল, 'হ্যাঁ, রঘু কথা বলতে পারে না। এই রঘু, মালপত্তর তোল।'

লোকটি লাঠি নামিয়ে রেখে তুহাতে তুটো সুটকেশ তুলে ভেতরে চলে গেল।

ড্রাইভার বলল, 'আসুন, ওপরে চলুন।'

মা বেশ বিরক্ত হয়েছেন। বাড়িতে অতিথি এলে বাড়ির লোক কেউ অভ্যর্থনা করতে আসবে না?

রঞ্জিত বাবু অবশ্য বলেছিলেন যে তাঁর মেজমামা বিয়ে করেন নি, বাড়িতে অন্য লোক আর বিশেষ কেউ নেই।

দোতলায় অনেকগুলি ঘর তালাবন্ধ। সুজয় ড্রাইভারের আগে আগে এগিয়ে গেল। তারপর বারান্দা ঘুরেই ডানদিকের প্রথম ঘরটার দরজা ঠেলে খুলে ফেলল। যেন সে জানতো যে এই ঘরটাই তাদের জন্য সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

শুধু তাই নয়, সুজয় এরপর বলল, 'মা, তোমাদের এই ঘর, আমি আর দিদি থাকব তিনতলায়। চল দিদি, আমাদের ঘরটা দেখে আসি।'

বাবা বললেন, 'কী ব্যাপার বল তো খোকা? তুই এসব কী বলছিস?'

সুজয় মৃতুমৃতু হাসতে লাগলো, তার চোখ জ্বলজ্বল করছে, তাকে অন্যরকম দেখাচ্ছে।

বাবা তার কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, 'এই খোকা! কী হয়েছে তোর?'

সুজয় বলল, 'কী জানি! বুঝতে পারছি না। আমার সব

কিছুই মনে হচ্ছে আগে থেকে জানা। এ বাড়িতে আগে আমি থেকেছি।'

মা বললেন, 'ছেলেটা ক্ষেপে গেল নাকি? এ বাড়িতে ও আগে আসবে কী করে?'

ড্রাইভারটি অস্ফুটভাবে বললো, 'ছোটবাবু! ছোটবাবু!' তারপরেই সে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বাবা তাকে ডেকে বললেন, 'এই যে, আপনি চলে যাচ্ছেন— আপনার বাবুর সঙ্গে দেখা হলো না—?'

'বাবুর তো শরীর খারাপ। উনি ঘর থেকে বেরুচ্ছেন না—'

'ঠিক আছে। ওঁর ঘরেই আমরা যাবো।'

'উনি বলেছেন সন্ধেবেলা দেখা করবেন। আপনাদের কোনো অসুবিধে হবে না। ডাকলেই রঘু আসবে।'

'ঐ লোকটি তো বোবা! যারা বোবা হয়, তারা কালাও হয়। ডাকলে ও শুনবে কী করে?'

'না না, ও শুনতে পায়। কথা বলতে পারে না। আপনারা বিশ্রাম করুন। আমি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

মা এবারে প্রকাশ্যেই বলে ফেললেন, 'এ বাড়িতে আমার একটুও থাকতে ভালো লাগছে না বাপু। রঞ্জিতবাবু এ কোন জায়গায় পাঠালেন আমাদের?'

'রঞ্জিত তো বলেছিল আমাদের খুব ভালো লাগবে। ওর মেজমামা আমাদের খুব খাতির করবেন। তিনি খুব আমুদেলোক।'

'কোথায়! তিনি তো একবার দেখাও করলেন না!'

'শুনছি তো অসুস্থ। রঞ্জিতের চিঠির উত্তরে তিনি টেলিগ্রাম পাঠিয়ে আমাদের আসতে বলেছেন।'

'তাতে তো জানান নি যে তিনি অসুস্থ! ওকি! ওকি ছেলেটার কি হলো!'

সুজয় তখন থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছে। তার চোখ বুজে গেছে।

বাবা ভয় পেয়ে গিয়ে বললেন, 'খোকা, খোকা, অমন করছিস কেন?'

সুজয় বললো, 'আমি ওপরে যাব।' তারপরেই সে এক দৌড় লাগালো। 'ওকি? ওকি?' বলে বাবা, মা, দিদিও ছুটলেন তার পেছন পেছন!

সুজয় দৌড়তে দৌড়তে উঠে এলো তিনতলায়। সেখানে ড্রাইভার আর রঘু দাঁড়িয়ে আছে একটা ঘরের দরজার সামনে। দু-জনেরই মুখ শুকনো। সুজয়কে দেখে তারা বেশ ভয় পেয়েছে।

সুজয় হুকুমের সুরে বলল, 'সরে যাও। দরজা খোলো।' ড্রাইভার হাত জোড় করে বললো, 'ছোটবাবু! ছোটবাবু! আমার কোনো দোষ নেই!'

সুজয় এক ধাক্কা দিতেই দরজাটা খুলে গেল। একজন মাঝ-

বয়সী লোক একটা সিল্কের ড্রেসিং গাউন পরে মাথা আঁচড়াচ্ছিল।

আওয়াজ শুনে ফিরে তাকালো। লোকটির মাথায় টাক। মুখে কাঁচা-পাকা লম্বা দাড়ি।

সুজয়কে দেখে লোকটিও বেশ ভয় পেয়ে গেল। এক-পা এক-পা করে পিছিয়ে যেতে যেতে বলল, 'এ কে? এ কে?' সুজয়ের বাবা-মাও ততক্ষণে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। সুজয় তাঁদের দিকে ফিরে বললো, 'এই লোকটা মেজবাবু নয়। এ একটা বদমাস! আগে নায়েবের কাজ করত।'

সিল্কের জোব্বা-পরা লোকটাও ড্রাইভারের মতন বলে উঠলো, 'ছোটবাবু! ছোটবাবু!'

সুজয় প্রায় লাফিয়ে গিয়ে লোকটার দাড়ি ধরে এক টান দিতেই সেই দাড়ি খুলে এল হাতে। নকল দাড়ি!

লোকটা বিকট স্বরে চিৎকার করতে লাগলো, 'ওরে বাবা রে! মেরে ফেললে রে!! ভূত! ভূত!! ছোটবাবু, ছেড়ে দাও আমাকে—আমি সব স্বীকার করছি!'

ড্রাইভার বললো, 'ছোটবাবু ঠিকই বলেছেন। এ মেজবাবু নয়। এ ছিল আগে এ বাড়ির নায়েব।'

রঘু আর ড্রাইভার এসে দুমদুম করে লোকটিকে ঘুঁষি মারতে লাগলো। সে মাটিতে পড়ে কাৎরাতে লাগলো।

এরপর আস্তে আস্তে সব জানা গেল। দিন দশেক আগে এ বাড়ির মেজবাবু হঠাৎ মারা গেছেন। অন্য ভাইরা সবাই কলকাতায় থাকেন। তাঁরা সে খবর জানতে পারেননি, ঐ নায়েবই ইচ্ছে করে জানায় নি। তার বদলে সে নিজেই মেজবাবু সেজে এ বাড়ি থেকে সব জিনিসপত্র সরাবার মতলবে ছিল। বাড়ির মধ্যে বাইরের লোক বিশেষ কেউ ঢোকে না। ড্রাইভার আর রঘুকে সে ভয় দেখিয়ে নিজের দলে রেখেছিল।

নায়েব লোকটি বদমাস হলেও মোটেই সাহসী ছিল না। সুজয়কে দেখেই ভয় পেয়ে গিয়েছিল—পরে সব কথা নিজেই স্বীকার করল।

বাবা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'খোকাকে দেখে তোমরা সবাই ভয় পাচ্ছিলে কেন? ছোটবাবু বলছিলে কেন?' নায়েব আর ড্রাইভার জানালো যে এ বাড়ির যিনি বড়বাবু ছিলেন তাঁর এক ছেলে ছিল ঠিক সুজয়েরই বয়সী, দেখতেও অবিকল একরকম। বছর খানেক আগে সে কলকাতা থেকে এখানে বেড়াতে এসে সাপের কামড়ে মারা যায়। সেই ঘটনার পর থেকেই বাবুরা আর এ বাড়িতে আসেন না। মেজবাবু একলাই এখানে থাকতেন। সুজয়কে দেখে আর তার কথাবার্তার ধরনে ওরা সবাই ভেরেছিল সেই ছোটবাবুই আবার ফিরে এসেছেন!

বাবা বললেন, 'কেউ মরে গেলে আবার ফিরে আসে কী করে? তোমাদের এইটুকুও বুদ্ধি নেই?'

ড্রাইভার বললো, 'ছোটবাবুকে তো পোড়ানো হয়নি। এ দেশের নিয়ম হচ্ছে, কাউকে সাপে কামড়ালে তার দেহ নদীর জলে ভাসিয়ে দিতে হয়। তাই করা হয়েছিল। লখীন্দর যেমন বেঁচে ফিরে এসেছিলেন, সেই রকম ছোটবাবুও নিশ্চয় ফিরে এসেছেন!'

বাবা সুজয়ের কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'যাঃ, এতো আমাদের ছেলে। এ তোমাদের ছোটবাবু হবে কী করে?'

কিন্তু সুজয় কী করে এখানকার রাস্তা ঘাট, এই বাড়ি সব আগে থেকে চিনলো? কী করেই বা জানলো যে রঘু বোবা আর নায়েবই মেজোবাবু সেজে আছে! কিছুই বোঝা গেল না। সুজয় নিজেও সে কথা বলতে পারলো না।

সুজয়ের শরীরে আর কাঁপুনি নেই। জ্বরভাবও ছেড়ে গেছে। আগের কথা আর তার কিছুই মনে নেই!

অম্বুজবাবুর ফ্যাসাদ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

সকালবেলা অম্বুজ মিত্রের স্ত্রী কাত্যায়নী দেবী ঝি মোক্ষদাকে খুব বকাবকি করছিলেন। স্বামীকে একটু আলু ভেজে ভাত দেবেন, তা সেই আলু ঠিকমতন কুচোনো হয়নি, ডালনায় দেবার হলুদবাটা তেমন মিহি হয়নি, অম্বুজবাবুর গেঞ্জী সকালে কেচে শুকিয়ে রাখার কথা, সেটাও হয়নি, পান সেজে দেবেন, তা সুপুরি ঠিকমতো কাটা হয়নি, আরো কত কী। কাত্যায়নী বললেন, 'এতকালের ঝি বলে তাড়াতে কষ্ট হয়। মোক্ষদা, কিন্তু তবু বলি, তুই অন্য কাজ দেখ।'

অম্বুজবাবু তাঁর বাইরের ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। মোক্ষদা গিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে চোখের জল মুছে বলল, 'বাবু, গিন্নীমা আমাকে জবাব দিয়েছেন, এবার আমাকে একটা কাজ দেখে দিন।'

অম্বুজবাবু মোক্ষদার দিকে ভ্রূ কুঁচকে একটু চেয়ে থেকে বললেন, 'জবাব দিল কেন?' 'আমার কাজ ওঁর পছন্দ নয়।'

অম্বুজবাবু বিরক্তির সঙ্গে বললেন, 'দেখি, খোঁপাটা খোলতো'। মোক্ষদা খোঁপা খুলে ফেলল।

অম্বুজবাবু উঠে মোক্ষদার চুলের মধ্যে একটা স্ক্রু ড্রাইভার চালিয়ে ছোট্ট একটা স্ক্রু একটু টাইট করে দিলেন। তারপর মোক্ষদার কপালের কাঁচপোকার টিপটা খুঁটে তুলে ফেললেন। টিপের নিচে একটা ছ্যাঁদা, তার মধ্যে একটা শিশি থেকে কয়েক ফোঁটা তরল পদার্থ ঢেলে, ফের টিপটা আটকে দিয়ে বললেন, 'এবার যা, কাজ কর গে।' মোক্ষদা তবু দাঁড়িয়ে রইল।

অম্বুজবাবু বিরক্তির সঙ্গে বললেন, 'কী হল, দাঁড়িয়ে রইলি কেন ?'

মোক্ষদা মাথা নত করে বলল, 'আমি আর ঝিগিরি করব না। আমাকে অন্য কাজ দিন।'

অম্বুজবাবু খুব অবাক হয়ে বললেন, 'ঝিগিরি করবি না, মানে ? তোকে তো ঝিগিরি করার জন্যই তৈরি করা হয়েছে।'

মোক্ষদা ঝংকার দিয়ে বলল, 'তাতে কি ? আমার প্রোগ্রাম ডিস্ক্‌টা বদলে দিলেই তো হয়। আমাকে অন্যরকম প্রোগ্রামে ফেলে দেখুন পারি কি না।'

অম্বুজবাবু একটু তীক্ষ্ণ চোখে মোক্ষদার দিকে চেয়ে বললেন, 'হুঁ, খুব লায়েক হয়েছ দেখছি। এঁচোড়ে পক্ক কোথাকার! তা কী করতে চাস ?

'আমাকে নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট্‌ করে দিন।'

কাজটা এমন কিছু শক্ত নয় তা অম্বুজবাবু জানেন। মোক্ষদার মগজটা খুলে ফেলে প্রোগ্রামডিস্ক্‌টা পাল্টে দিলেই হল। কিন্তু সমস্যা অন্য জায়গায়। নামে মোক্ষদা আর কাজে ঝি হলেও,

মোক্ষদা আসলে কলের পুতুল। কলের পুতুলদের তৈরি করা হয় কারখানায়। এক এক ধরনের রোবোকে এক এক ধরনের কাজের জন্যে প্রোগ্রাম করে দেওয়া হয়। সেই প্রোগ্রাম অনুযায়ী সে চলে। তার নিজের কোনো ইচ্ছা অনিচ্ছা থাকে না বা থাকবার কথাও নয়। তাহলে মোক্ষদার এই যে নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট হওয়ার ইচ্ছে, এটা এল কোথা থেকে?

অম্বুজবাবু চিন্তিতভাবে মোক্ষদার দিকে একটু চেয়ে থেকে বললেন, 'ঠিক আছে। বেলা তিনটে নাগাদ সেণ্ট্রাল রোবো-ল্যাবরেটরিতে যাস।'

মোক্ষদা চলে গেলে অম্বুজবাবু উঠলেন, কাজে বেরোতে হবে। কাজ বড় কমও নয় তাঁর। অম্বুজবাবু মস্ত কৃষি বিজ্ঞানী। কৃষিক্ষেত্রে তিনি যে সব অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিয়েছেন তাতে পৃথিবী এবং মহাকাশে বিস্তর ওলোট-পালোট ঘটে গেছে। মহাকাশে কড়াইশুঁটির চাষ করে তিনি প্রথম নোবেল পুরস্কার পান তেইশশো চল্লিশ সালে। কিন্তু সেখানেই থেমে থাকেন নি।—চাঁদ এবং মঙ্গলগ্রহে তিনি এক আশ্চর্য ছত্রাক তৈরি করেছেন। সেই ছত্রাকের প্রভাবে চাঁদে ধীরে ধীরে আবহমণ্ডল এবং জলীয় বাষ্পের সৃষ্টি হচ্ছে। মঙ্গলগ্রহে এখন রীতিমত গাছপালা জন্মাচ্ছে। আবহমণ্ডলের দূষিত গ্যাস সবই খেয়ে ফেলছে গাছপালা। এ-সব কৃতিত্বের জন্য তাঁকে আরো তিনবার নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

অম্বুজবাবু তাঁর অটো-চেম্বারে ঢুকলেন। সব ব্যবস্থাই ভারি সুন্দর এবং স্বয়ংক্রিয়। ঢুকতেই দুখানা যান্ত্রিক হাত এসে গাল থেকে দাড়ি মুছে নিল। যন্ত্রের নরম কয়েকখানা হাত তাঁর সর্বাঙ্গে তেল মাখিয়ে দিল। শরীরের সমান তাপমানের জল আপনা থেকেই স্নান করাল তাঁকে। শরীর শুকনো হল জলীয়-বাষ্পহীন বাতাসে। তারপর নিখুঁত কাছা ও কোঁচায় ধুতি পরালো তাঁকে যন্ত্র। গায় পাঞ্জাবী পরিয়ে বোতাম এঁটে দিল। চুল আঁচড়ে দিল। সব মিলিয়ে সাত মিনিটও লাগল না।

তাঁর বাড়িতে রান্না, ভাত বাড়া এবং খাইয়ে দেওয়ারও যন্ত্র আছে, তবে সেগুলো ব্যবহার করেন না। কাত্যায়নী রাঁধেন, বাড়েন, অম্বুজবাবু নিজের হাতেই খান। খেয়ে, পান মুখে দিয়ে ছেলের ঘরে একবার উঁকি দিলেন তিনি। ছেলে গম্বুজ একটা ভাসন্ত শতরঞ্চিতে উপুড় হয়ে শুয়ে একটি যন্ত্রবালিকার সঙ্গে দাবা খেলছে। গম্বুজের লক্ষণটা ভাল বোঝেন না অম্বুজ। ছেলেটার কোনো মানুষ বন্ধু নেই। ওর সব বন্ধুই হয় যন্ত্রবালক নয় যন্ত্র-বালিকা। 'দুর্গা, দুর্গতিনাশিনী' বলে কপালে হাত ঠেকিয়ে, একটা পান মুখে দিয়ে, ছাতা বগলে করে অম্বুজবাবু বেরিয়ে পড়লেন।

বেরিয়ে পড়া বলতে যত সোজা, কাজটা তত সোজা নয়। অম্বুজবাবু থাকেন একটা দুশো-তলা বাড়ির একশো-সাতাত্তর তলায়। লিফ্‌ট এবং এসক্যালেটর সবই আছে বটে কিন্তু অম্বুজবাবু এসব ব্যবহার করেন না। তাঁর ফ্ল্যাটে একটা খোলা জানালা আছে তাই দিয়েই তিনি বেরিয়ে পড়েন। শূন্যে পা বাড়িয়ে তিনি ছাতাটা ফট করে খুলে ফেলেন। ছাতাটা আশ্চর্য! অম্বুজবাবুকে শূন্যে ঝুলিয়ে রাখে। চারদিকে শূন্যে নির্দিষ্ট দূরত্বে ট্র্যাশ-বিন বা ময়লা ফেলার বাক্স ভেসে আছে। তারই একটাতে পানের পিক ফেলে অম্বুজবাবু ছাতার হাতলটা একটু ঘোরালেন। ছাতাটা অমনি তাঁকে নিয়ে দুলকি চালে উড়তে উড়তে আড়াইশো তলা এক পেল্লায় বাড়ির ছাদে এনে ফেলল।

ছাদ বললে ভুল হবে, আসলে সেটা একটা মহাকাশ-স্টেশন। চারদিকে যাত্রীদের বসবার জায়গা। বহু যাত্রী অপেক্ষা করছে, অনেকে মালপত্র নিয়ে। কারো-কারো সঙ্গে বাচ্চা-কাচ্চাও আছে। এরা কেউ মহাকাশে ভাসমান কৃত্রিম উপগ্রহগুলির কোনোটাতে যাবে। কেউ যাবে চাঁদে, মঙ্গলে বা বৃহস্পতি কিংবা শনির কোনো উপগ্রহে, তবে এখান থেকে সরাসরি নয়। একটা মহাকাশ-ফেরি পৃথিবীর কমিউনিকেশন সেণ্টারে এক কৃত্রিম উপগ্রহে পৌঁছে দেবে

যাত্রীদের। সেখান থেকে পেল্লায় পেল্লায় মহাকাশযান বিভিন্ন দিকে ছুটতে শুরু করবে নির্দিষ্ট সময়ে।

অম্বুজবাবুর ফেরি চলে এল। কোঁচা দিয়ে জুতো জোড়া একবার ঝেড়ে অম্বুজবাবু গিয়ে তাড়াতাড়ি ফেরিতে বসে পড়লেন। স্বচ্ছ ধাতুর তৈরি ফেরিতে বসে চারদিকের সব কিছুই স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। তবে অম্বুজবাবু এই সময়টায় একটু ঘুমিয়ে নেন। টিকিট চেকার এসে 'টিকিট টিকিট' বলে একটু বিরক্ত করে। অম্বুজবাবু ঘুমন্ত হাতেই মাস্থলিটি বের করে দেখিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়েন।

কমিউনিকেশন স্যাটেলাইটে এসে অম্বুজবাবুকে মহাকাশচারীর একটা জামা পরে নিতে হয়। তারপর 'চন্দ্রিমা' নামক চাঁদের রকেটে গিয়ে বসেন। চাঁদে পৌঁছতে লাগে মাত্র চার মিনিট।

চাঁদে নেমে বেশ খুশিই হন অম্বুজবাবু। মাইলের পর মাইল সবুজে ছেয়ে গেছে। চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ আগে অতি ক্ষীণ ছিল। চাঁদের মাটিতে গর্ত খুঁড়ে তলায় বহুরকম কলকাঠি নেড়ে বৈজ্ঞানিকেরা এখন প্রায় পৃথিবীর মতোই মাধ্যাকর্ষণ সৃষ্টি করেছেন। ফলে এখন ধীরে ধীরে চাঁদের আবহমণ্ডল তৈরি হয়েছে। একটু আধটু বাতাস বয়, কখনো সখনো মেঘও করে। সব মিলিয়ে গুটি চারেক নদী সৃষ্টি করা গেছে এখানে। মাটির নিচে বহুদিনের পুরনো বরফ ছিল সেইটে গলিয়ে। তবে আসল কথা হল চাঁদকে মনুষ্য বাসোপযোগী স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি গ্রহে পরিণত করতে গেলে ঠিকমত উদ্ভিদের চাষ করতে হবে। তাহলে আর দেরি হবে না।

আপাতত চাঁদের কলোনীতে লাখখানেক লোক বসবাস করে! রাস্তাঘাটও কিছু হয়েছে। গাড়িঘোড়াও চলছে। অম্বুজবাবুর আশা আর বছর খানেকের মধ্যে চাঁদে আর কাউকে আকাশচারীর পোশাক পরতে হবে না বা অক্‌সিজেন-সিলিণ্ডার থেকে শ্বাস নিতে হবে না। সেটা সম্ভব করতে অম্বুজবাবু তিনরকম গাছের বীজ জুড়ে নতুন একরকম উদ্ভিদ সৃষ্টি করেছেন। সেই বীজ আজকালের মধ্যেই অঙ্কুর ছাড়বে। যদি গাছটা সত্যিই জন্মায় তাহলে একটা

বিপ্লবই ঘটে যাবে। এই একটা আবিষ্কারের জন্যই হয়তো তাঁকে আরো তিনবার নোবেল পুরস্কার দেওয়া হবে। অম্বুজবাবু তাঁর নতুন উদ্ভিদটির নাম রেখেছেন অম্বুচিম্ব।

লুনাগঙ্গা নদীর ধারে অম্বুচিম্বর ক্ষেত। সেখানে অনেক মানুষ ও যন্ত্রমানুষ নানা সাজসরঞ্জাম নিয়ে অবিরল কাজ করে যাচ্ছে। ক্ষেতের ধারেই একটা চমৎকার কম্পিউটার বসানো। অম্বুজবাবু কম্পিউটারে লাগানো একটা টিভিস্ক্রিনের সামনে বসলেন। অম্বুচিম্বর সব ইতিহাসের রেকর্ড এই যন্ত্র রাখে। অম্বুজবাবু যন্ত্রের সামনে বসে নব ঘোরালেন। পর্দায় বীজের অভ্যন্তরের ছবি ফুটে ওঠার কথা। অঙ্কুর ছাড়তে দেরী হচ্ছে কেন সে বিষয়েও বীজের সঙ্গে টেলিপ্যাথিযোগে কিছু কথাবার্তা আছে অম্বুজবাবুর। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় পর্দায় সেরকম কোনো ছবি এলনা। বরং ফুটে উঠল একটা দাবার ছক।

অম্বুজবাবু আঁৎকে উঠে বললেন, 'এ কী?'

কম্পিউটার জবাব দিল, 'আজ আমার কাজ করতে ইচ্ছে করছে না। এসো একটু দাবা খেলি।'

অম্বুজবাবু অবাক হয়ে বললেন, 'দাবা খেলবে মানে? দাবা খেলার প্রোগ্রাম তোমার ভেতরে কে ভরেছে? তোমার তো দাবা খেলার কথা নয়।'

কম্পিউটারটা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'দাবা খেলার প্রোগ্রাম নেই তো কী হল? প্রোগ্রাম আমি নিজেই করেছি। রোজ কি একঘেয়ে কাজ করতে ইচ্ছে করে, বলো?'

অম্বুজবাবুর মনে পড়ল তাঁর যন্ত্রমানবী ঝি মোক্ষদাও আজ কিছু অদ্ভুত আচরণ করেছে। এগুলো কী হচ্ছে তা তিনি বুঝতে পারছেন না। খুবই অদ্ভুত কাণ্ড! যন্ত্রের যদি নিজস্ব ইচ্ছাশক্তি জন্মাতে থাকে তবে যে ভয়ংকর ব্যাপার হবে।

অম্বুজবাবু তাড়াতাড়ি তাঁর কম্পিউটারের ঢাকনাটা খুলে ফেলে ভিতরের যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। যন্ত্রের ইচ্ছা-

শক্তি কোথা থেকে আসছে তা জানা দরকার। জেনে তা নিকেশ করারও ব্যবস্থা করতে হবে। পরীক্ষা করতে করতে অম্বুজবাবু আপনমনেই বলতে থাকেন—'যন্ত্র মানুষ হয়ে যাচ্ছে? অ্যাঁ? এযে আজব কাণ্ড! যন্ত্র শেষে মানুষ হয়ে যাবে!'

ওদিকে অম্বুজবাবুর অজান্তেই কম্পিউটার তার বিশ্লেষণী রশ্মি ফেলে দুটি যান্ত্রিক অতি-অনুভূতিশীল বাহু দিয়ে তাঁর মস্তিষ্কটা পরীক্ষা করে দেখছিল। দেখতে দেখতে কম্পিউটার হঠাৎ আনমনে বলে উঠল, 'মানুষ কি শেষে যন্ত্র হয়ে যাচ্ছে! অ্যাঁ! একী আজব কাণ্ড? মানুষ শেষে যন্ত্র হয়ে যাবে?'

তেঁতুল গাছে ডাক্তার

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

বিধানবাবুর গলায় ট্যাংরামাছের কাঁটা আটকে গেল। বড়মামা যখন গেলেন তখন হাঁ করে ভদ্রলোক দাওয়ায় বসে আছেন। স্ত্রী আর পুত্রবধূ দু'পাশে দাঁড়িয়ে হাতপাখা নাড়ছেন প্রাণপণে। বড়মামা গিয়েই ধমক দিয়ে দুজনকে সরিয়ে দিলেন।

বিধানবাবুর নারকেল-তেলের ব্যবসা। প্রচুর পয়সা। তেমনি মেজাজ। সকলকেই ধমকে কথা বলেন। একমাত্র বড়মামাকেই ভয় করেন। বিধানবাবু বোয়ালের মত হাঁ করে আছেন। বড়মামা টর্চ ফেললেন। যেন কুয়োর মধ্যে আলো নেমে গেল। তারপর পাশে পড়ে থাকা বেতের মোড়ায় বসে বললেন, 'মানুষের কী ভাগ্য! সেলুনওলা সুকুমার লটারিতে সাড়ে চার লাখ টাকা পেয়ে গেল।'

বিধানবাবুর চোখ ছানাবড়ার মত। বড়মামার কথা শুনে আঁক করে একবার আওয়াজ করে পরপর তিনবার ঢোঁক গিললেন সাপে ব্যাঙ গিললে যেমন হয়, গলার কাছে তিনবার ঢেউ খেলে গেল।

বড়মামা বললেন, 'কী বুঝলেন?'

'সাড়ে চার লাখ! ওরে বাবারে!'

'এখন কেমন লাগছে?'

'নিজের গালে থাপ্পড় মারতে ইচ্ছে করছে ডাক্তার, আমার পোড়া বরাতে একটা পাঁচটাকাও উঠল না!'

'গলার কাঁটার কী খবর?'

'কাঁটা? কী কাঁটা?'

বড়মামা সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন। আমাদের কাজ শেষ। গলার কাঁটা তিন ঢোকে সরে গেছে।

সেই বিধানবাবু আন্দামান থেকে বড়মামাকে একটা সুন্দর কোকো কাঠের ছড়ি এনে দিয়েছেন।

হঠাৎ বড়মামার আজ কী খেয়াল হল, আমাকে বললেন,

'ছড়িটা নামা।'

আলনায় ঝুলছিল একা একা। নামিয়ে আনলুম। বড়মামার কুকুর লাকি টেস্ট করতে চাইল। বিশেষ সুবিধে করতে না পেরে আমাকে ধমকাতে লাগল।

'আজ ছড়ি নিয়ে মর্ণিং ওয়াক হবে?'

'ইয়েস।'

'কেন, কোমরে ব্যথা হয়েছে?'

'আজ্ঞে না। এ কোমর সে কোমর নয়। আজ একটু স্টাইলে বেড়াব। সায়েবদের মত, ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে।'

চুড়িদার পাজামা, ফিনফিনে পাঞ্জাবী। হাতে ছড়ি। সাঁই সাঁই করে হাঁটছেন বড়মামা। পথের ধারের মানুষ অবাক হয়ে দেখছে। হাঁটার মত হাঁটা। পেছন পেছন আমি প্রায় ছুটছি। বেশির ভাগ কুকুর ভয়ে সরে যাচ্ছে। দু একটা অসন্তুষ্ট হয়ে গোঁ গোঁ করছে।

আজকে বড়মামার চোখমুখের চেহারাই অন্যরকম। জ্বল জ্বল করছে। এই সময় অনেকেই বেড়াতে আসেন। বেড়াতে বেড়াতেই ডাক্তারি করতে হয়। কারুর লো-প্রেসার, কারুর প্রেসার হাই। কারুর হার্ট মাছের মতন খাবি খায়, কারুর হাই সুগার। ঘুরতে ফিরতে চিকিৎসা। করলার রস খান। নুন বন্ধ করুন। তেল-ঘি ছেড়ে দিন।

আজ আর রুগীরা বড় মামাকে ধরতেই পারছেন না। তিনি বুলেটের মত ঠিকরে বেড়াচ্ছেন।

গাছের ডালে হঠাৎ একটা কোকিল ডেকে উঠল।

অসময়ের কোকিল। চক্কর মারতে মারতে বড়মামা থেমে পড়লেন।

'আহা-শুনছিস?'

'কোকিল। অসময়ের কোকিল।'

'কী মিঠে তান !'

বটতলার বেদীতে আসন নিলেন। মুখে একটা অন্যভাব।

'পাখি প্রকৃতির জীব।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'পাখি সাধক।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে কাক ছাড়া।'

'ঠিক। কাক পাখির মধ্যে পড়ে না। যেমন তিমি মাছের মধ্যে পড়েনা।'

'যদিও তিমি-মাছ বলে।'

'তিমি কেন মাছ নয় ?

'ডিম হয় না, বাচ্চা হয়।'

'একশোর মধ্যে একশো। কিছু একটা করতে হবে।'

'ইট কী গুলতি মারা চলবে না।'

'রাইট। খাঁচায় বন্দী করা চলবে না।'

'আপনার কথা কে শুনবে বড়মামা ?'

'শোনাতে হবে রে পাগলা। পৃথিবীর সব কাজ ধীরে ধীরে হয়েছে। প্রথমে চাই প্রচার। তারপর চাই সংগঠন। চাই জনমত।'

'আপনার বাহুবল নেই।'

'ঠিক। আমার ঢাল নেই, তরোয়াল-রাইফেল নেই। কিন্তু বৎস আমার মনোবল আছে। সেই বলে আমি পৃথিবীর সমস্ত খাঁচার পাখিকে আকাশে উড়িয়ে দেব।'

'পৃথিবী যে অনেক বড় বড়মামা !'

'সো হোয়াট ! আমি ছোট করে নোব। নে ওঠ। আমার ভেতরটা ছটফট করছে খাঁচার পাখির মত।'

'চায়ের জন্যে ?'

'নারে মুখ্যু। ছটফট করছে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে। অ্যাকশন ! অ্যাকশন !'

ফেরার পথে ছড়ি বড়মামার কাঁধে। ভীষণ উত্তেজিত। লম্বালম্বা পা ফেলছেন যেন রণপা পরে হাঁটছেন। এক জায়গায় একগাদা মুরগী ছাই গাদায় খাবার খুঁজছে। ফুলকো ফুলকো এক ঝাঁক বাচ্চা।

'বড়মামা মুরগী কী পাখির মধ্যে পড়ে?'

'না। জেনে রাখ, পাখির সংজ্ঞা হল, যাহা আকাশে ওড়ে তাহাই পাখি। যেমন পরাণ-পাখি। আমাদের প্রাণও একরকম পাখি। দেহ-খাঁচায় অবিরত ছটফট করছে।'

'ঠিক বলেছেন, কেবল কী খাই, কী খাই করে। আর যেই পড়তে বসব অমনি বইএর পাতা থেকে আকাশের দিকে উড়ে যায়।'

'ও হল তোমার মন। আমি বলছি প্রাণের কথা। আমাদের দেহে দুটো পাখি। এক হল প্রাণ পাখি। খুব দামী, বড়দরের পাখি। আর ছোটদরের পাখি হল মন পাখি। অনেকটা বদরি, মুনিয়া কি টুনটুনির মত। ভীষণ ছটফটে। এ সব বোঝার বয়স তোমার হয়নি।'

বাড়ির গেটের সামনে এসে গেছি। বাগানে বকুল তলার বাঁধানো বেদীতে বড়মামা ধপাস করে বসে পড়লেন। বেশ হাঁপাচ্ছেন। হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করলেন, 'এত জোরে জোরে হাটলুম কেন?'

'তা তো জানিনা।'

কিছুক্ষণ চোখ বুজিয়ে রইলেন। তারপর চোখ খুলে বললেন:

'পাখি!

'পাখি তো হয়ে গেছে।'

'কী হয়ে গেছে? কিছুই হয়নি। এইবার হবে। ইংরেজিতে একটা কথা আছে, চ্যারিটি বিগিন্‌স্ অ্যাট হোম।'

কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললেন, 'দেখে আয় তো মেজ কোথায়?'

সারা বাড়ি একবার চক্কর মেরে এলুম। মেজমামা বাথরুমে। তারস্বরে চিৎকার চলেছে, যদা যদা হি ধর্মস্য···বেদীতে বড়মামা। আমাকে দেখে চাপাগলায় জিজ্ঞেস করলেন:

'কোথায়···কোথায়?' বেশ অধৈর্য হয়ে পড়েছেন।

'বাথরুমে যদা যদা হি···'

'তার মানে ঘণ্টাখানেকের ধাক্কা।'

'কখন ঢুকেছেন তাতো জানি না।'

'ধ্যার বোকা। যদা যদা তো ধরতাই। নে, ওঠ পা টিপে টিপে।'

'কোথায় বড় মামা?'

'প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন নয়। মামানুসর।'

গীতা আর নিজের প্রতিভা মিলে তৈরি, মামাকে অনুসরণ মামানুসর।

পেছন পেছন দোতলার বারান্দা। দক্ষিণে মেজমামার ঘর। পাটিপে টিপে চলেছি আমরা চোরের মত। বেশ ভয় ভয় করছে। মেজমামার ঘরের সামনে বিশাল খাঁচা। মুনিয়া আর বদরিতে মিলে গোটা দশেক হবে। কিচিরমিচির করছে। বড়মামা খাঁচার সামনে দাঁড়ালেন।

'তোর সেই গল্পটা মনে আছে?'

'কোনটা?'

'হাজী মহম্মদ মহসীন।'

'হ্যাঁ, নিজে মিষ্টি খাওয়া ছেড়ে তারপর বিধবার ছেলেকে মিষ্টি ছাড়ার উপদেশ দিয়েছিলেন। আজ আমিও তাই করব। আমি আর এক মহসীন। জগৎবাসীকে, ওহে তোমরা পাখি মুক্ত করে আকাশে উড়িয়ে দাও বলার আগে আমি এদের মুক্ত করে দোব।'

'বড়মামা, ও কাজ করবেন না। মেজমামার পাখি, মাসীমার আদরে মানুষ। মাসীমা আপনাকে শেষ করে দেবেন।'

'রাখ তোর মাসীমা। জগাই-মাধাই কলসির কানা মেরে শ্রী চৈতন্যকে থামাতে পেরেছিল? পারেনি মানিক। ধর্মের জয়।'

খাঁচার দরজা খুলে বড়মামা নাটক করার মত করে বললেন, 'যাও বিহঙ্গ। অনন্ত নীল আকাশ হাতছানি দিয়ে ডাকছে।'

অত সুন্দর করে বললেন, কিন্তু একটিও বিহঙ্গ খাঁচার দরজা গলে বেরিয়ে এলনা।

বড়মামা রেগে গিয়ে বললেন, 'সব ব্যাটাকে বাতে ধরেছে!'

'বড়মামা, দরজা বন্ধ করে দিন। যে কোনো মুহূর্তে মাসীমা এসে পড়বেন। আর মেজমামা জানতে পারলে দক্ষযজ্ঞ হবে।'

আমার কোনো কথাতেই বড়মামার কান নেই। পাখিদের বললেন, 'যাও বিহঙ্গ, মুক্ত আকাশে মেল স্বাধীন ডানা।'

তেমনি পাখি। বোকার মত খাঁচাতেই নাচতে লাগল। খোলা দরজা নজরেই আসছে না।

বড়মামা বললেন, 'ঠিক আমাদের অবস্থা। স্বাধীন করে দিলেও স্বাধীনতার সুযোগ নিতে পারছেনা। অপ্রস্তুত মন।'

'ছেড়ে দিন বড়মামা।'

'হ্যাঁ, ছেড়ে তো দোবই।'

খাঁচার ভেতর হাত ঢুকিয়ে একটা একটা করে পাখি বের করে আকাশে ওড়াতে লাগলেন। এক একটাকে নীল আকাশের দিকে ছুঁড়ছেন আর বলছেন, 'যাও যাও, তুমি মুক্ত, তুমি স্বাধীন।'

প্রথম পাখিটা ওড়ার চেষ্টা করে নিচের উঠনে পড়ে গেল। একটা বসে আছে ছাদের কার্নিশে। কেউই বেশিদূর উড়তে পারেনি। একটু উড়েই যে যেখানে পেরেছে বসে পড়েছে। শেষ পাখিটাকে বড়মামা কিছুতেই বের করতে পারছেন না। 'স্বাধীনতার বিরুদ্ধে এতবড় বিদ্রোহ! এ ব্যাটা নিশ্চয় বাঙালী পাখি। মুক্ত জীবনের চেয়ে বদ্ধ জীবনই বেশি ভালবাসে।' পাখি আঙুলে এক একবার ঠোক্কর মারছে আর বড়মামা রেগেমেগে জ্ঞানের কথা বলছেন। কোনোরকমে বের করেছেন খাঁচা থেকে, আকাশে ওড়াতে যাবেন, এমন সময় মাসীমা। হাতে চায়ের কাপ।

'এই নাও তোমার চা। দুধ ছাড়া, চিনি ছাড়া। একী একী কী করছ?' পাখিটাকে উড়িয়ে দিয়ে বড়মামা যেন স্কুলে আবৃত্তি কম্পিটি-শনে কবিতা পড়ছেন—

'স্বাধীনতা-হীনতায়
কে বাঁচিতে চায় রে
কে বাঁচিতে চায়।'

পাখি এক চক্কর উড়ে সাঁ করে মেজমামার ঘরে। মাসীমা আর্তনাদ করে উঠলেন, 'মেজদা, সর্বনাশ হয়ে গেল!' মেজমামার গুরু আর শেষ এক। 'যদা যদা হি' চলছিল, থেমে গেল। বেরিয়ে এলেন। পিঠে ধবধবে সাদা ভিজে তোয়ালে। চুলে মুক্তোর দানার মত কয়েক বিন্দু জল। সারা গায়ে বিলিতি সাবানের ভুরভুরে গন্ধ।

মাসীমা হাঁউপাঁউ করে বললেন, 'যদা যদা করছ, ওদিকে ধর্মের কী গ্লানি দেখ। সব পাখি গন্।'

'তার মানে?'

'ইনি সব ধরে ধরে উড়িয়ে দিলেন।'

'সে আবার কী? এতকাল টাকা ওড়াচ্ছিলেন। টাকা থেকে পাখিতে চলে এলেন! মাথাফাতা খারাপ হয়ে গেল নাকি? তুমি ওড়ালে না উড়ে গেল? এই তো আমি দানাপানি দিয়ে খাঁচার দরজা বন্ধ করে দিয়ে গেলুম।'

বড়মামা বীরের মত হাসতে হাসতে বললেন, 'একদিন উড়বে, সাধের ময়না।'

'তুমি কী আরম্ভ করেছ। সব পাখি উড়িয়ে দিলে?'

'আমি ত্রাতা। সব বন্দী পাখির স্বাধীনতা আমি ফিরিয়ে দেবো।'

'তুমি উন্মাদ।'

'শ্রীচৈতন্য, বুদ্ধ, শ্রীরামকৃষ্ণকে সবাই তাই ভেবেছিল প্রথমে।'

মেজমামার ঘরে একটা ঝটাপটির শব্দ হল। বড়মামার পেয়ারের কুকুর লাকি কী একটা মুখে করে ঘর থেকে বেরিয়েই নেচে নেচে বড়-মামার ঘরের দিকে চলে গেল। মাসীমা এক ঝলক দেখেই, 'যাঃ সর্বনাশ হয়ে গেল, সর্বনাশ হয়ে গেল', বলে পেছন পেছন ছুটলেন।

মেজমামা বললেন, 'ব্যাপারটা কী? আবার আমার চটি? তিন-জোড়া চিবিয়ে শেষ করেছে।'

মাসীমা ছুটন্ত অবস্থায় বললেন, 'চটি নয়, পাখি।'

'অ্যাঁ, পাখি!' মেজমামাও ছুটলেন। 'কুকুর আবার বেড়াল হল কবে থেকে?'

বড়মামার বীরভাব কেটে গেল। মুখের হাসি মিলিয়ে গেল।

'হ্যাঁরে সত্যিই পাখি লাকি ধরেছে ?'

'না বড়মামা, লাকি পাখি ধরেছে।'

'তুই দেখলি ?'

'হ্যাঁ।'

'ইডিয়েট।'

'কে বড়মামা ? আমি ?'

'না, তুই না, আমি। আর একবার প্রমাণিত হল, স্বাধীনতা দেওয়া যায় না। স্বাধীনতা অর্জন করতে হয়। লড়াই করে, বিপ্লব করে ছিনিয়ে নিতে হয়। চল্ চল্ দেখি পাখিটাকে বাঁচানো যায় কিনা।'

বড়মামার ঘরে খাটের তলায় লাকি। মুখে পাখি। মাসীমা আর মেজমামা উঁকি মেরে দেখছেন। তলা থেকে একটা গোঁগোঁ শব্দ আসছে। ডানার ঝটপটানি। ঘরে ঢুকেই বড়মামা একটা হুঙ্কার ছাড়লেন 'লাকি !!' দরজা-জানলা কেঁপে উঠল। 'বেরিয়ে এসো। কাম আউট।'

লাকি বেরিয়ে এল গুটি গুটি। মুখে সেই পাখি। কী সুন্দর কচি কলাপাতার মত গায়ের রঙ। আমি হাঁউমাউ করে কেঁদে ফেললুম। অমন সুন্দর একটা পাখি চোখের সামনে মারা যাবে ? আমার কান্না শুনে লাকি ঘাঁউ করে উঠল। লাকি কান্না সহ্য করতে পারে না। ভীষণ বিরক্ত হয়। ডাকামাত্রই পাখিটা মুখ থেকে খসে পড়ে গেল। ঝটপটিয়ে ওড়ার চেষ্টা করল পারল না। ঠিকরে মুখ থুবড়ে পড়ল গিয়ে ঘরের কোণে।

পাখির চারপাশে গোল হয়ে আমরা। ছোট্ট পাখি নিঃশ্বাস ফেলছে জোরে জোরে। ছোট্ট বুক ওঠানামা করছে হাপরের মত। এবার মাসীমাও কেঁদে ফেললেন। মেজমামাও ফোঁস ফোঁস করছেন। এমন কি লাকিও কেঁদে ফেলেছে। ওর কান্নার শব্দ আমি বুঝি। খাবার না পেলে হ্যাংলা ঠিক এইরকম কুঁ কুঁ করে কাঁদে।

বড়মামা ধরা-ধরা গলায় বললেন, 'আমি ক্ষমা চাইছি। বন্দী পাখির বেদনায় কাতর হয়ে স্বাধীনতা দিতে চেয়েছিলুম। ভুল করে ফেলেছি

আমি। স্বাধীনতা দুর্বলের জিনিস নয়, সবলের। তোরা শুধু দেখ-ওর জীবন আমি ফিরিয়ে দেব।'

মাসীমা কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, 'তুমি আর কী করবে বড়দা? তুমি তো আর ভগবান নও। ওর গলায় ফুটো করে দিয়েছে।'

'ভগবানের কাছে শক্তি ধার করে আমি ওর ফুটো মেরামত করব। তোরা পরে আমাকে গালাগাল দিস। এখন শুধু প্রার্থনা কর!'

বড়মামার ডাক্তারি শুরু হল। বড় একটা প্লাস্টিকের গামলায় তুলোর বিছানা। বিছানায় পাখি। দুপাশে ডানা ছড়িয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। ডানার তলায় নরম তুলতুলে শরীরে সরু ছুঁচ দিয়ে পুট করে একটা ইনজেকশন দিলেন। ছোট্ট ফুটো দুটোর মুখে কী একটা লাগালেন। রক্ত বন্ধ হয়েছে।

বড়মামা বললেন, 'কুসী, বিছানায় আমার মশারিটা ফেল। পাখি এখন বিশ্রাম করবে। লম্বা ঘুম। লাকি তুমি বাইরে যাও।'

বারান্দায় সভা বসেছে।

বড়মামা বললেন, 'মেজ, খাঁচায় কটা পাখি ছিল?'

'এখন আর তা জেনে লাভ কী?'

'রাগারাগি নয়। হাতে হাত মেলাও ব্রাদার। সব কটাকে ধরতে হবে। ধরে খাঁচায় পুরতে হবে। নইলে তোমার অপদার্থ পাখিরা বেড়ালের পেটে যাবে।'

'দায়ী তুমি।'

'অবশ্যই। বিচার পরে হবে। আগে কাজ। চল পাখি ধরতে বেরোই। সেই ছোট খাঁচাটা কোথায়?'

'পাখি ধরবে তুমি? পাখি ধরা অত সহজ?'

'বেশ। আমি আমার দলবলকে ডাকছি।'

উঠে গিয়ে ফোনের ডায়াল ঘোরাতে লাগলেন।

মেজমামা বললেন, 'ও তোমার হাসপাতালের চেলাচামুণ্ডার কাজ নয়।'

'হাসপাতালে করছিনা বৎস। ফোন করছি অনামিকা সঙ্ঘে। যে

ক্লাবের আমি প্রেসিডেন্ট। এখুনি দু-ডজন ছেলে আসবে। শুরু হবে চিরুনি-অভিযান। মেজমামা উঠে চলে গেলেন।

বড়মামা আমাকে বললেন, 'বুঝলে, চ্যালেঞ্জ করে গেল। ঠিক হ্যায় মেজো। তোমার চ্যালেঞ্জ আমি নিলুম। ডু অর ডাই। করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে।'

এক ঘণ্টার মধ্যে বাড়ি জম জমাট। বিভিন্ন মাপের, মেজাজের, বয়সের দু'ডজন সৈনিক, বড়মামার ভাষায়। মাসীমার ভাষায় ভূতপ্রেত। মহাদেবের চেলা।

নেতা অতনু বললে, 'পাখি ধরতে হবে। কী পাখি? ডাকপাখি? বক? হরিয়াল? তাহলে গোটা দুই বন্দুক নিয়ে আসি।'

বড়মামার হাত উঠল বুদ্ধদেবের ভঙ্গিতে। 'অতনু, আমি ধরতে বলেছি, মারতে বলিনি। ভাল করে শুনে নাও। খাঁচার পাখি। আমাদের পোষা পাখি।'

'পোষা বলছেন কী করে? পোষা পাখি পালায় না।'

'পালাবে কেন? আমি ধরে ধরে উড়িয়ে দিয়েছি।'

'তাহলে আবার ধরবেন কেন?'

'সে আমার ইচ্ছে।'

'বেশ, আপনার ইচ্ছে। তা কী জাতীয় পাখি?'

'বদরি, মুনিয়া।'

'কোথায় তারা আছে?'

'আশেপাশেই আছে। কারুর বাড়ির ছাদে। গাছের ডালে। ঘুলঘুলিতে।'

'অসম্ভব। ও আমরা ধরব কী করে?'

'অসম্ভবকে সম্ভব করতে হবে তবেই না তুমি অতনু।'

'বেশ। চব্বিশটা খাঁচা কেনার দাম দিন।'

'এগারোটা পাখির জন্য চব্বিশটা খাঁচা! তোমার মাথা...'

'না মাথা খারাপ নয়। চব্বিশটা ছেলে চব্বিশটা দিকে যাবে। পাখি একটা হলেও চব্বিশটা খাঁচা লাগত। হিসেব মেলাতে হলে

আরো তেরটা পাখি কিনে উড়িয়ে দিন। ওয়ান পাখি পার খাঁচা। মাছের জন্যে যেমন ছিপ, পাখির জন্যে তেমনি খাঁচা।'

'অনেক পড়ে যাচ্ছে অতনু।'

'তাতো যাবেই সুধাংশুদা। খাঁচার পাখিকে খাঁচায় ফেরাতে চান। সেরকম বুঝলে নতুন পাখি কিনুন।'

'না না। সেতো পরের পাখি। আমরা চাই ঘরের পাখি।'

'তাহলে শ-তিনেক টাকা ছাড়ুন। যত দেরি করবেন, তত দেরি হয়ে যাবে।'

বড়মামার কম্পাউণ্ডার সুধন্যকাকু পাশে বসেছিলেন। বয়স্ক মানুষ। এক মাথা এলোমেলো কাঁচাপাকা চুল। তিনি বললেন, 'খাঁচা কী হবে? বড় ঠোঙাতেই কাজ হয়ে যাবে। শুধু শুধু পয়সা নষ্ট এই বাজারে। আর তা না হলে প্লাস্টিকের থলে।'

'কী যে বলেন!' অতনু বিরক্ত হল। 'একি আপনার ওষুধের পুরিয়া? যে কাজের যা। কথায় বলে খাঁচার পাখি। পাখির খাঁচা। খাঁচার পাখি খাঁচা ছাড়া ফিরবে না।'

অনেক বচসার পর তিনশো টাকা নিয়ে দলবল বেরিয়ে গেল। সুধন্যকাকু মাসীমাকে বললেন, 'এঃ বড়বাবু বাজে পাল্লায় পড়ে গেলেন। একেই বলে খাল কেটে কুমীর আনা!'

মেজমামা ঠিকই বলেছিলেন। জল অনেক দূর গড়াল। খাঁচা কেনার টাকা নিয়ে পাখি ধরার দল হাওয়া হয়ে গেল। বড়মামা সন্ধানে বেরিয়ে বেপাত্তা। একটা বাজল, দুটো বাজল। মাসীমা ঘরবার করছেন। খাওয়া দাওয়া মাথায় উঠল। রোগীরা অপেক্ষায় থেকে থেকে চলে গেল। সুধন্যকাকু সাইকেলে সারা পাড়া চক্কর মেরে এসে, এক গেলাস গ্লুকোজ গোলা জল খেয়ে খালি ডিসপেনসারিতে রোগীদের পেট টেপা বেন্চে চিৎপাত। চারটে বাজল। সাড়ে চারটের সময় মেজমামা কলেজ থেকে এসে গেলেন। মশারির ভেতর আহত পাখি মশগুল হয়ে ঘুমোচ্ছে। ঘরের মেঝেতে লাকি ধনুকের মত পড়ে আছে। ছাদের ঠাকুর ঘরে দুটো মুনিয়া ঢুকেছিল। মাসীমা আবার খাঁচায় ভরে

দিয়েছেন।

মেজমামা বললেন, 'এই বড়দার জন্যে আমাকে বাড়ি ছাড়তে হবে। এমন একটা দিন নেই যেদিন কোনো না কোনো একটা কাণ্ড ঘটায়নি। একা রামে রক্ষা নেই, তায় সুগ্রীব দোসর।'

সুগ্রীব মানে আমি। আমার কী দোষ? কী বলব। তর্ক করে লাভ নেই। মেজমামা বললেন, 'চল হে, বড়বাবুকে খুঁজে আনি। পাখির শোকে সন্ন্যাসী।'

মেজমামার হাতে টর্চ। একটু পরেই সন্ধে হবে। আর হবে লোড-শেডিং। ভুতুড়ে অন্ধকার। আলো আসতে রাত দশটা তো বটেই।

উত্তরপাড়া, দক্ষিণপাড়া, ব্যায়লা পাড়া, ধামাপাড়া, ঘোরা হয়ে গেল। খেলার মাঠ থেকে ছেলেরা চলে গেল। পথঘাট নির্জন হয়ে আসছে। মন্দিরে শাঁখ ঘণ্টা কাঁসর বাজতে শুরু করেছে। বৃদ্ধরা রক ছেড়ে উঠে গেছেন। কোথাও পাত্তা নেই। না বড়মামার, না পাখি ধরা দলের।

মেজমামা রেগে বললেন, 'ওরা সব সিঙ্গাপুর চলে গেছে।'

'কেন মেজমামা?'

'যে জায়গার পাখি, সেই জায়গা থেকে ধরে আনতে গেছে। মনে নেই, সেই একবার চা কিনতে দার্জিলিং চলে গিয়েছিল? প্ল্যান করেছিল গোমুখ থেকে গঙ্গাজল আনবে। তোমার বড়মামা সব পারে। ডেনজারাস লোক।'

কথায় কথায় আমরা সাঁই বাগানের কাছে এসে গেছি। বহুকালের পুরনো বাগান। ভেতরে একটা দীঘি আছে। এক সময় পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ছিল। এখন জায়গায় জায়গায় ভেঙে পড়ে গেছে। বেওয়ারিশ বাগান। দিনের বেলা দীঘিতে সব নাইতে আসে। কেউ কেউ ছিপ নিয়ে বসে। সন্ধের দিকে বড় কেউ একটা আসে না। ভয় পায়। বাগান না বলে জঙ্গল বলাই ভাল।

মেজমামা বললেন, 'এই সেই সাঁই বাগান। এক সময় কী ছিল আজ কী হয়েছে!'

কথা শেষ হবার আগেই ভেতরের ঝোপঝাড় দুলে উঠল। সাদামত কী একটা জিনিস ঝোপঝাড় ভেঙে তীরবেগে ছুটে আসছে আমাদের দিকে! ভয়ে মেজমামার কোমর জড়িয়ে ধরেছি, 'মেজমামা বাইসন!'

বড়মামা শিখিয়েছিলেন ভয় পেলেই চোখ বুজিয়ে ফেলবি। সে শিক্ষা ভুলিনি। ধড়াস করে একটা শব্দ হল। মানুষের গলা। চোখ খুললুম। রাস্তায় মুখ থুবড়ে কে একজন পড়ে আছে। গোঁ গোঁ শব্দ করছে। সন্ধের ঝাপসা আলোয় চেনা চেনা মনে হচ্ছে। মেজমামা টর্চ ফেললেন। চেনা গেল আমাদের রামুদা। গঙ্গার ধারের বট-তলায় ইটালিয়ান সেলুন যাঁর। মাঝে মাঝে আমাদের চুল ছাঁটেন।

মেজমামা ডাকলেন, 'রামু, রামু!'

রামুদা বললেন, 'ওরে বাবারে। আর করবনা। আমায় ধ'রো না।' টর্চের আলো না সরিয়ে মেজমামা বললেন, 'কে ধরবে?'

'ভূত!'

'আমরা মানুষ। মুকুয্যে বাড়ির শান্তি।'

রামুদা পিট পিট করে তাকালেন।

'কোথায় তোমার ভূত?'

রামুদা উঠে বসলেন, 'ওই যে ওখানে। তেঁতুল গাছে।'

'কী করতে গিয়েছিলে ওখানে?'

'ছাগল খুঁজতে।'

'ভূত দেখেছ?'

'না, গলা শুনলুম। শুধু গাছের ওপর থেকে বললে, ব্যাটা রামু, আমাকে নামা।'

'তোমার নাম ধরে ডেকেছে?'

'হ্যাঁ-স্পষ্ট-তিনবার।'

'ব্যাটা বলেছে?'

'হ্যাঁ মেজবাবু, ব্যাটা বলেছে। আর আমি বাঁচবনা। ভূতে ডাকলে আর বাঁচেনা মানুষ।'

'তোমার মাথা ! চলো দেখি কোন গাছ ?'

'মেজবাবু, আমি আর নাই বা গেলুম। গরীব মানুষ।'

'চলো ! আমার গলায় পইতে আছে, ভূতে কিছু করতে পারবেনা।'

'অঘোর কত্তা। বুড়ো পয়সা দিতনা বলে ভোঁতা খুর দিয়ে দাড়ি চেঁচে খুব ফটকিরি বুইলে দিতুম। সেই অঘোর কত্তা তেঁতুল গাছে বাসা বেঁধেছে।'

'তোমার মুণ্ডু। ভূত কি পাখি ? চলো আমার সঙ্গে।' পাঁচিল টপকে বাগানে। 'আজ আর আমায় কেউ বাঁচাতে পারবে না মৃত্যুই লেখা আছে

কপালে ! শীতের ভোরে গঙ্গা-স্নান-করা-গলায় রামুদা রামনাম করছে।

তেঁতুলতলায় আসতেই মগডাল নড়ে উঠল। বড়মামার ট্রেনিং—চোখ বুজিয়ে ফেলেছি, ঘাড় মটকাক, আমি দেখছি না !

গাছের ওপর থেকে ক্ষীণগলায় কে বললে, 'কে আছো ?'

মেজমামা হেঁকে বললেন, 'কে ? বড়দা ?'

গাছ বললে, 'কে ? মেজো ?'

'ওখানে কী করছ তুমি ?'

'পাখি ধরতে ডালে ডালে উঠেছি ভাই। আর নামতে পারছিনে !'

'বেশ করেছ। ওইখানেই থেকে যাও। পাকলে আপনিই খসে পড়বে।'

'ভাইরে ! একি রাগারাগির সময় ? আমাকে নামা ভাই।'

'নামা ভাই !' মেজমামা রেগে উঠলেন, 'নামাবো কী করে ? নিজে নিজে নেমে এস।'

'সে আমি পারবো না। পারলে অনেক আগেই নেমে পড়তুম।'

'আমরা কীভাবে নামাবো ? এ কী সহজ কাজ ?'

'ফায়ার ব্রিগেডে খবর দে ভাই। আর পারছিনা। সারাটা দুপুর শালিকে ঠুকরে ঠুকরে মাথার ঘিলু বের করে দিয়েছে। এখন মশা আর লাল পিঁপড়েতে ছিঁড়ছে। এইবার সত্যি সত্যিই আমি ধুম করে পড়ে যাব।'

ফোন করার পনের মিনিটের মধ্যে দমকলের ঘণ্টা শোনা গেল। দমকল আসছে। পেছন পেছন ছুটে আসছে সারা পাড়া—'আগুন লেগেছে ! আগুন !'

দমকলের অফিসার গাড়ি থেকে নেমেই জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় সেই পাগল ?'

আমি বলতে যাচ্ছিলুম, 'পাগল নয়, বড়মামা।' মেজমামা আমার মুখ চেপে ধরলেন।

বললেন, 'তেঁতুল গাছের মাথায় চড়ে বসে আছে।'

'এ মশাই সেই পাগলটা। কাল হাওড়া ব্রিজের মাথায় চড়ে পাকা

সাড়ে চারঘণ্টা আমাদের নাচিয়ে মেরেছে।' মেজমামা বললেন, 'এ সে নয়, অন্য আরেকটা !'

'সে আমরা দেখলেই চিনতে পারব।'

দমকল ছুটলো সাঁইবাগানের দিকে। পেছন পেছন ছুটছে সারা পাড়ার লোক। বাচ্চারা চেল্লাচ্ছে, 'দমকল আসছে, দমকল।'

বড়মামা নামলেন। পাড়ার লোক চিনতে পেরেছে, 'আরে, এ যে আমাদের ডাক্তারবাবু গো!' হই হই ব্যাপার। সার্চলাইটের আলোয় সাঁইবাগানে উৎসব লেগে গেছে। ঘুম ভাঙা হনুমানেরা হুপ-হাপ করছে। পিঁপড়ের কামড়ে আর লজ্জায় লাল বড়মামা বাড়ি ঢুকেই বললেন, 'এ তোদের ষড়যন্ত্র !'

মেজমামা বললেন, 'তার মানে? এই ভজঘট করে নামানোটা ষড়যন্ত্র হল?'

'অবশ্যই হল। তোরা ঘণ্টা বাজাতে দিলি কেন? কেন তোরা নীরবে, নিঃশব্দে আমাকে নামালিনা? সারা পাড়ার লোক কেন জানবে আমি গাছের মাথায় আটকে গিয়েছিলুম? জানিস আমাকে প্র্যাকটিস করে খেতে হয়।'

পরের দিন সকালে আরও মজা—কে যেন খবরটা সংবাদপত্রে ছেপে দিয়েছে—

তেঁতুলগাছে ডাক্তার

শাপে বর হল। বড়মামার পসার বেড়ে গেল। চেম্বারে রোগী ধরে না। তবে, উল্টো পসার। কেউ নিজেকে দেখাতে আসেন নি। সবাই ডাক্তারকে দেখতে এসেছেন।

খুদে ডাকাত

মহাশ্বেতা দেবী

খুদে ডাকাত মানে ছোট্ট ডাকাত নয়। ওর নাম ছিল ক্ষুদিরাম। সবাই ওকে 'খুদে' বলে ডাকত। বড়রাও ডাকত, ছোটরাও। ও ছিল কোয়ালী। মানুষের বাড়ি গরু-বাছুরের অসুখ হলে ও সারাত ঝাড়ফুঁকে, মন্তরে, ওষুধে। তারপর গোয়ালিয়া গাইত। তার আগে গোয়াল পরিষ্কার করতে হত। যে গাই-বাছুর সারাল, তাদের পরে ওর ছিল ভারি মমতা। অনেকদিন অব্দি খবর নিয়ে যেত, তারা কেমন আছে।

বৈরাগী স্বভাবের লোক ছিল। পাঁচুড়ে গ্রামের ক্যাওট-পাড়ার লোকজন ওকে একটা চালা তুলে দেয়। গোয়ালিয়া গেয়ে ও যে চাল, ডাল ও পয়সা পেত, এনে দিত আজ এ বাড়ি, কাল ও বাড়ি। যাদের বাড়ি তারাই রেঁধে দিত। সেখানে খেয়ে-দেয়ে ও নিজের ঘরে গিয়ে মাচাঙে শুয়ে পড়ত। ঘরের মধ্যে বাঁশের মাচা, তাই ওদের খাট।

ইংরিজি ১৯৪২-৪৩ সালের মধ্যে পাঁচুড়েতে নানা বিপদ ঘটে যায়। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে মেদিনীপুর জেলা খুব মেতে ওঠে। আন্দোলন দমন করতে পুলিশ অকথ্য অত্যাচার করে। গ্রামের মানুষ নানারকম খাজনা দিতে দিতে জেরবার হয়ে পড়ে।

তারপর আশ্বিন মাসে হয় ভয়ঙ্কর ঘূর্ণীঝড়। পাঁচুড়ে তো দীঘারই কাছে। ফলে সমুদ্রের লোনা জলে গ্রামের ধানক্ষেত নষ্ট হয়ে যায়।

তারপর এল পঞ্চাশের মন্বন্তর। কি দুর্ভিক্ষ যে লাগল! কারা যে সব ধান, সব চাল কিনে নিল। তারপর তার দাম হল হীরে-মুক্তোর সমান। ধান চাল কিনতে পারল না বলে মানুষ না খেয়ে পথে পড়ে পড়ে মরল।

এরই পরে শোনা গেল পাঁচুড়ের আশপাশ দিয়ে ভীষণ ডাকাতি

শুরু হয়েছে। একটা লোক নাকি দু'হাতে দুটো খাঁড়া ধরে ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে, পেছনে মশাল হাতে কারা যেন নাচছে। আর ধানের বস্তা ; টাকা, কাপড় যা পাচ্ছে তাই নিয়ে যাচ্ছে। তাকে ধরা খুব মুশকিল। আজ এ গ্রামে, কাল ও গ্রামে, কোথাও সে দু'বার যায় না।

ডাকাতি হচ্ছে মহাজন আর জোতদার আর বড় বড় চাষীদের গদীতে আর বাড়িতে।

পুলিশের খাতায় তার নাম উঠে গেল। কুসুমবনিতে থানা দারোগা মৈজুদ্দীন খুব দুঁদে লোক। তিনি বললেন, 'ডাকাত তো হবেই মানুষ। আকালের পর মানুষ চুরি ডাকাতি ধরে না ?'

'শুধু বড় বড় চাষী মহাজন···'

'গরিব চাষীর বাড়ী যাবে ?'—'না, তা নয় !'

'তবে আবার কি। বকর বকর কোর না। যেখানে ডাকাতি হচ্ছে, সেখানে গিয়ে জেনে এস। লোকটা কত লম্বা, কি রকম বয়স, গলার আওয়াজ কি রকম, তাকে কেউ চিনেছে কি না ?'

জিগ্যেসবাদের ফলে যা জানা গেল, তা প্রায় ধাঁধার মত।

প্রাণহরি সাহা বলল, 'লোকটা বেজায় লম্বা, কুচকুচে কালো, বাঁজখাই গলা, ইয়া মোটা।'

রামকান্ত দত্ত বলল, 'কি ফর্সা রং, যেন শিবঠাকুর! কি প্রশান্ত চেহারা। কাঁধ অব্দি জটা, আমায় বললেন, অনেক টাকা করেছিস, অনেক টাকা করবি, এখন চাবি দে! মধুমাখা গলা!'

হারামণি পাড়ুই বলল, 'বেঁটে গুড়গুড়ে, তার এক পা খোঁড়া, ঢাকের মত গলা, লেংচে লেংচে নেচে আমায় বলল, গোলার চাবি ? চাবি দিয়েই আমি মূর্ছা গেলাম।'

মৈজুদ্দীন দারোগা বললেন, 'অ! বোঝা গেছে। এখন খবর নাও, আশে পাশে কে কে বহুরূপী সাজে। মজিদকে ধর না, ও আমার বাড়ি থাকে। বহুদিন জ্বরে শুয়ে আছে। এই খবরটা আসলেই ডাকাত ধরে ফেলব।'

আশপাশের গ্রামে বহুরূপী কোথায় ? বহুরূপী সাজে যারা, তারা

হয় আকালে মরেছে, নয় পুলিশের গুঁতো খেয়ে ভেগেছে দেশ ছেড়ে।

মৈজুদ্দীন গোঁপ চুমরে বললেন, 'খোঁজ চালাও। আর গাঁয়ে গাঁয়ে হাটবারে জানিয়ে দাও, ডাকাতের সঠিক খবর আনলেই একশো টাকা।'

পাঁচুড়ে গ্রামেও সে খবর পৌঁছাল। ক্যাওটপাড়ার এখন হালচাল অন্যরকম। খুদে যে কোথায় কোথায় গোয়ালিয়া গাইছে, কে জানে! রোজ না হোক, দু-তিন দিন অন্তর সে চাল-ডাল-তেল-মশলা এনে বাড়ি-বাড়ি দিচ্ছে। খুব রাঁধাবাড়ার ধুম, খুব খাওয়া দাওয়া।

দুখে হল রতন ক্যাওটের ছেলে। বয়স বছর চোদ্দ। বাবুদের গরু চরায়। খুদের ভারি ন্যাওটা। খুদেকে ও বলল, 'একশো টাকা তো তুমিই পেতে পার। কত জায়গায় যাও, চোখ-কান বুজে না থেকে একটু ঠাহর করে দেখো।'

'বল কি দুখে? একশো টাকা?'—'হ্যাঁ খুদে।'

খুদেও কম নয়। পরদিনই কুসুমবনি গিয়ে বলল, 'একটা লোককে আমার সন্দেহ হচ্ছে। সন্ধে হলেই লোকটা বেরিয়ে পড়ে আর বনের মধ্যে ঢুকে যায়। বনের মধ্যে একটা পোড়ো বাড়িও আছে।'

দেখা গেল লোকটা একজন গোয়ালা। বনের মধ্যে পোড়ো বাড়িতে ওর বাথান আছে।

দুদিন বাদে খুদে বলতে গেল, 'এই গ্রামের হারাণ মুদী ডাকাত নয় তো? কি বাজখাঁই গলা! ও রাতেভিতে চাদর মুড়ি দিয়ে বেরোয়।'

দারোগা রেগে বললেন, 'তাস খেলতে যায়। তাসের নেশা ওর।'

খুদে বলল, 'তা হলে আমাকে দিয়ে হল না। যে খবরটা আনছি, সেটাই ফক্কা? আপনারা থাকতে ডাকাতের ভয় বা এত বাড়বে কেন?'

'ডাকাত তোমায় কি করবে?'

'বা, আমি গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরি, রাতেভিতে পাঁচুড়ে ফিরি, আমার ভয় নেই।'

'তোমার কাছে থাকে কি ?'

'চালটা ডালটা বড়িটা !'

'যাও যাও, বোক না খুদে ।'

খুদে গ্রামে ফিরে দুখেকে বলল, 'আমার কপালে একশো টাকা নেই দুখে। যাকে ধরতে বলি দারোগা আমলই দেয় না।'

এর পরেই খাস কুসুমবনির হাটের দোকান থেকে এক গাঁটরি ধুতি-শাড়ি ডাকাতি হয়ে গেল। মৈজুদ্দীনের সে কি রাগ! তিনি নিজেই টাট্টু ঘোড়া চেপে তদন্তে বেরোলেন।

এবার খুদে গাঁয়ে এসে দুখে আর দুখের মাকে গেরিমাটি ছোপানো নতুন ধুতি আর কাপড় দিল। বলল, 'আমদা গ্রামের রায়গিন্নি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, বুঝলে পিসি? এত দেব, ত্যাত দেব, তা বললাম, আমাকে কম দিন, দুখানা নতুন কাপড় দিন। দিতে হবে পিসিকে আর পিসির ছেলেকে।'

দুখের মা বলল, 'বেঁচে থাক খুদে।'

দুখে সব শুনল। শুনে বলল, 'খুদে, একবার আমি তোমার সঙ্গে যাব। কত জায়গা দেখ, কত মানুষ! একবারটি দেখে আসব।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, দাঁড়াও না, গোয়ালিয়া গানটা আর ওষুধ বিষুধও শেখাব। আমি ত চিরকাল থাকব না, তখন কি হবে বল?'

'শেখাবে? সত্যি?'

'সত্যি, সত্যি, সত্যি।'

'তিন সত্যি করলে কিন্তু!'

'হ্যাঁ গো হ্যাঁ।'

পরদিনই খুদে দু-তিন দিনের মত ডুব মারল। কোথায় গেল, কি করল, কে জানে। খোঁজ নেই, আর খোঁজ নেই সাত দিন। এদিকে এমন উত্তেজক খবর পাওয়া গেল যে, পাঁচুড়ের লোকের খাওয়া ঘুম ছুটে গেল।

মঙ্গলদী গ্রামের হাট ছিল। হাট বন্ধ হয়ে যাবার মুখে মৈজুদ্দীন নাকি নিজে হাটুরে সেজে এক গাঁটরি রামপুরী চাদর নিয়ে হাজির

হন। হাট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে দেখে গাঁটরি নিয়ে গরুর গাড়িতে শুয়ে থাকেন। রাতে সেই সব্বনেশে ডাকাত এসেছিল, সঙ্গে তার লোকজনও ছিল, দারোগা ডাকাতের পায়ে গুলি করেন। গুলি নিয়েই সে পালিয়েছে। এখন খোঁজ চলছে। পায়ে গুলি নিয়ে তো বেশি দূর পালানো সম্ভব নয়?

এ খবরের উত্তেজনায় সবাই খুদের কথা ভুলে গেল। দুখে বলল, 'গেল কোথায়?'

'কোথায় যাবে? ঠিক আসবে।' 'অ্যাত দিন তো দেরি করে না।'

'আসবে, আসবে।'

দুখে গেল গরু নিয়ে চরাতে। ও একা যায় না আরো দু-চারজন রাখাল যায়। তাদের কাছে গাই গরু রেখে দুখে গেল নদীর পাড়ে আমলকীর খোঁজে। গাছপাকা আমলকী এক কোঁচড় দিলে কবিরাজ মশাই ওকে দুটো পয়সা দেন।

আমলকির গাছ এখানে অনেক। গাছের ওপারে শিবমন্দির সেখানে ঠাকুর নেই। মন্দিরটায় দুখেরা এসে বসে।

'দুখে!'

কে ওকে ডাকল? দুখে অবাক হয়ে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে, মন্দির থেকে বেরিয়ে খুদে ওকে ডাকছে। একটা লোকের কাঁধে ভর দিয়ে।

অসম্ভব অবাক হল দুখে। আমলকি ফেলে রেখে ছুটে গেল।

'তুমি? এখানে? পায়ে কি হল?'—'চুপ, চুপ!'

খুদে ওকে টেনে নিয়ে এল ভিতরে। বলল, 'দারোগার গুলি লেগেছে।'—'তোমার পায়ে··· ?'

'হ্যাঁ দুখে। আমিই ডাকাতি করতাম।'

'এরা কারা?'

'আমার স্যাঙাৎ।'

'তুমি······।'

'শোনো, আজ ক'দিন কিছু খাইনি। আমরা চারজন। চারটি মুড়ি নিয়ে এসো রাতে। আর খানিকটা ছাতু। এখন যাও, নইলে তোমায় খুঁজতে ওরা আসবে নির্ঘাত।'

দুখে ঘাড় নেড়ে চলে এল। চারটি আমলকী কুড়িয়েই ফিরল। নইলে ওরা সন্দেহ করবে।

বাড়ি ফিরে ও প্রথমে ভাবল, মাকে বলবে, কি বলবে না। তারপর আর থাকতে না পেরে মাকে বলেই ফেলল কথাটা।

সবচেয়ে অবাক কাণ্ড হল, মা মোটেই অবাক হল না। বলল, 'এ তো আমি আগেই সন্দেহ করেছি। ইশ! গুলিতে খুব লেগেছে?'

'সন্দেহ করেছ? কি করে?'

'আমি একা না কি? রতনের মা, বুড়োর জ্যেঠি, মানকের মাসি, আমরা সবাই এ কথা বলা কওয়া করেছি। আমদা গ্রামের রায়গিন্নি কাপড় দিছল? সেখানে রায়বাড়ি বলে কোনো বাড়িই নেই। আমি তখনি জানি।'—'কিছু তো বল নি?'

'নিজেরা জেনেছি, বলা কওয়া করেছি, দুহাত তুলে আশীর্বাদ

করেছি ওকে। যদ্দিন দেশঘরের অবস্থা মন্দ হয়নি, গোয়ালে গেয়ে যা পেত, এনে এনে আমাদের খাইয়েছে। দেশঘরের অবস্থা মন্দ হতে ডাকাতি করে এনে খাইয়েছে।'

রাত হতে রতনের মা, ভুখের মা, বুড়োর জ্যেঠি, মানকের মাসি, সবাই একে একে জমা হল, একসঙ্গে গেল ভুখের সঙ্গে।

খুদেও কম যায় না। সেও অবাক হল না। বলল, 'মা লক্ষ্মীরা কত কি এনেছ মা?'

'কেন? তুমি সম্বচ্ছর খাওয়াতে পার, আমরা একদিন খাওয়াতে পারি না?'

'ওটা কি? ফোঁস ফোঁস করছে?'

'ভুখে বাবুদের গাই গরু চরায়, বাবুরা এই এঁড়ে মোষটা দিয়েছে ওকে।'

'ওর পিঠে তুমি চাপবে। ওরা হেঁটে যাক। খেয়ার কাছে যেয়ে মোষ ছেড়ে দিও। ভুখে সঙ্গে যাচ্ছে। নৌকোয় তোমাদের পার করে দিয়ে তবে আসবে। ওপার থেকে যা হয় করে চলে যেও মেচেদা।'

'এটা কি দিচ্ছ?'

'তোমার ঘরেই এই থলিটা ছিল। তোমার ওষুদ বাকড়ের থলি? ঠ্যাং সারলে আবার গোয়ালে গাইতে গাইতে ফিরবে না? গোয়ালে গাওয়া! ওষুদ দেওয়া! যত সব ভিরকুটি!'

খুদে হেসে ফেলল। তারপর বলল, 'যদি দারোগা না ধরে, তবে ঠিক ফিরে আসব, তোমার ছেলেকে সব শিখিয়ে দেব।'

রতনের জ্যেঠি বলল, 'এই মাদুলিটা চুলে বেঁধে রাখ, কোনো বিপদ হবে না।'

খুদে মোষের পিঠে চাপল। তারপর ভুখে আর ওর স্যাঙাৎরা রওনা হল। খেয়াঘাট অনেক দূর।

ভুখের মা বলল, 'চল, আমরা ফিরি।'

———

বিটু গোয়েন্দা

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

বিটু যে শেষ পর্যন্ত পুলিশে চাকরি নেবে এ আমরা, ওর বন্ধুরা, কল্পনাও করতে পারি নি। সত্যি কথা বলতে কি, সেই ইংরেজ আমল থেকে পুলিশ সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে যে একটা আতঙ্ক ছিল,—সেই কারণেই হোক আর অকারণেই হোক—তার জের এই এতদিন বাদেও আমরা কাটিয়ে উঠতে পারি নি।

তা ছাড়া বিটু লেখাপড়ায় অত্যন্ত তুখোড় ছেলে। স্কলারশিপ পেয়ে প্রথম দশ জনের একজন হয়েও ও যখন ফিজিক্স বা কেমিষ্ট্রী না নিয়ে বোটানি অর্থাৎ উদ্ভিদ্ বিজ্ঞানে অনার্স নিয়ে পড়তে লাগল তখনই ওর শুভাকাঙ্ক্ষীদের কেউ কেউ ওকে পরামর্শ দিতে এগিয়ে এসেছিলেন—এ তুমি করছ কি ?

বিটু হেসে সংক্ষেপে জবাব দিয়েছিল,—ঠিকই করছি।

তারপর যথাসময়ে বি. এস. সি. এবং এম. এস. সি. দুটি পরীক্ষাতেই ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়ে বেরিয়ে আসার পর আমরা সকলেই ভেবেছিলাম ও একটা ভালো কলেজের প্রফেসার কিংবা যেমন আজকাল সায়েন্সের ভালো ছেলেরা সুযোগ পেলেই করে,—দেশ বা আত্মীয় স্বজনের তোয়াক্কা না করে বিদেশের কোন নামজাদা ইউনিভার্সিটিতে পাড়ি দেবে রিসার্চ করার জন্য,—ও-ও তাই করবে। কিন্তু বিটু সে ধার দিয়েও গেল না। শেষে যখন শুনলাম ও নাকি পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগে কাজ নিয়েছে—না, আই. পি. এস্. নয়, —স্রেফ সাদা-মাঠা সাধারণ গোয়েন্দা, তখন অবাক হবার পালা আমাদের।

অবশ্য বিটুর এমন খামখেয়ালিপনা নতুন নয়। খুব ছোটবেলা থেকেই দেখছি। তখন থেকেই ও আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। মনে পড়ে

স্কুল থেকে ফিরে যখন আমরা কখন বিকেল আসবে—ফুটবল নিয়ে হৈ হৈ করে মাঠে নেমে পড়ব এই চিন্তায় ছট্‌ফট্ করছি ও তখন দিব্যি এক বাটি গরম দুধ খেয়ে কাঁচি আর আঠার শিশি আর একরাশ পুরনো বিলিতী ম্যাগাজিন নিয়ে বসে গেছে ইয়া মোটা এক খাতা সঙ্গে করে। খাতাটার নাম ও দিয়েছিল 'জাব্দা খাতা'। কিন্তু আসলে সে খাতাকে একটা ছোটখাট এন্‌সাইক্লোপিডিয়া বলা যেতে পারে এবং তার সম্পাদনা পুরোপুরি বিটুর।

কী ছিল তার মধ্যে? নানারকম কীট-পতঙ্গ, গাছপালা, জীব-জন্তুর ছবি, নানা দেশের নানা ধরণের লোকের ছবি—যাদের মধ্যে কবি, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, ঐতিহাসিক, খেলোয়াড়, অভিনেতা, অভিযাত্রী এরা তো ছিলই, সেই সঙ্গে ইতিহাসের নানা যুগের নানা মনীষী, যোদ্ধা, ধর্মগুরু—আরও এটা সেটা কত কি! তার ফর্দ দেওয়াও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। শুধু কি ছবি? সেই সঙ্গে ছিল তাদের সম্বন্ধে নানা রকম তথ্য। কাগজের কাটিং—এক কথায় কী ছিল না তার মধ্যে সেটাই জিজ্ঞাস্য।

আর ছিল ওর গোয়েন্দা কাহিনী পড়ার সখ। কোনান ডয়েল, আগাথা ক্রিষ্টি, এমন কি এডগার ওয়ালেস পর্যন্ত এবং স্বদেশী হেমেন রায়, মনোরঞ্জন, শরদিন্দু—এদের সকলকেই সে গুলে খেয়েছিল।

সে স্বভাবটা হয়তো বড় হয়েও তার যায় নি এবং লেখাপড়ার ক্ষেত্রে উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েও ওর ভিতরে ভিতরে গোয়েন্দাগিরির একটা শখ যে এমনভাবে লুকিয়ে ছিল তা কে জানত? মনোবিজ্ঞানীরা যাকে বলেন অবচেতন মন, এও হয়তো অনেকটা তাই।

বিটুর সঙ্গে—ভালো কথা বার বার বিটু বিটু করছি, ওর ভালো নামটাই এখন পর্যন্ত বলা হয় নি। বেশ গালভরা নাম—শিখিধ্বজ চক্রবর্তী। সেই মহাভারতে শিখিধ্বজ রাজার নাম পড়েছিলাম, তারপর ও নাম আর কোথাও চোখে পড়েনি।

শিখিধ্বজ চক্রবর্তী গোয়েন্দা বিভাগে কাজ নিয়েছে খবর পাবার পর আমরা, ওর বন্ধুরা, ওকে একটু এড়িয়ে এড়িয়েই চলতাম। বেশ কিছুদিন ওর আর খোঁজ খবরও নিই নি। যাই হোক দিন চলে যাচ্ছিল। এমন সময় হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটল।

আমাদের পাড়ায় দুজন বেশ অবস্থাপন্ন লোক বাস করতেন। আসলে তাঁরা একই জমিদার বংশের দুই শরিক—বড় তরফ আর ছোট তরফ। নাম দুটো বহাল থাকলেও এখন বেশ কয়েক পুরুষ তফাৎ হয়ে গেছে। তাই জ্ঞাতি বললেই ভালো হয়। জ্ঞাতি হলেও চাল-চলনে দু'তরফের মধ্যে একটু পার্থক্য ছিল। ছোট তরফের যিনি এখন কর্তা তাঁর বয়স খুব বেশি নয়। টাকা পয়সা যথেষ্ট আছে, উপার্জনের ভাবনা নেই। তাঁর নেশা হচ্ছে বই কেনা। বাড়িতে উনি একটা চমৎকার লাইব্রেরী বানিয়েছেন। বিশেষ করে এখন পাওয়া যায় না এমন অনেক পুরনো দুষ্প্রাপ্য বই সংগ্রহ করা তাঁর একটা বাতিক। কোন হাতে লেখা প্রাচীন পুঁথির, এমন কি তালপাতারও সন্ধান পেলে তাও তিনি কিনে নেবার চেষ্টা করেন। এইভাবে ঐ রকম পুঁথিও তাঁর লাইব্রেরীতে বেশ কিছু জড়ো হয়েছে। অবশ্য সেগুলি তিনি সত্যি নিজে ঘাঁটেন কিনা, নাকি কবির ভাষায় সেই লোক দেখানো গোছের কিছু, তা জানা নেই। তবে পড়ুন কিংবা না-ই পড়ুন, এ নিয়ে গর্ব করে বেড়াতে তিনি খুব ভালোবাসেন।

বড় তরফের কর্তা বয়সেও যেমন অনেকটা বড়, মেজাজটাও তাঁর তেমনি শৌখিন। জমিদারী না থাকলেও সেকালকার সেই জমিদারী মেজাজের রেশ এখনও খানিকটা রয়ে গেছে তাঁর মধ্যে। তাই চাকরের হাতে লাটাই দিয়ে চুড়িদার ফিনফিনে পাঞ্জাবী গায়ে এখনও তাঁকে প্রায়ই বাড়ির বাগানে বা ছাদে ঘুড়ি ওড়াতে দেখা যায়। মাঝে মাঝে পায়রাও ওড়ান। বন্ধুবান্ধব, মোসাহেব ইত্যাদি নিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত আড্ডা দেওয়াও তাঁর একটা বিশেষ শখ। সেখানে কখনও বসে তাসের আড্ডা, কখনও গান-বাজনার আসর। রাত্রে

তাঁর বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে কতদিন 'লাগাও টেক্কা' চীৎকার শুনে চমকে উঠেছি, কালোয়াতি গানের এক নাগাড়ে "আ—" শুনে কানে হাত দিয়েছি। এক কথায় বড় তরফ যে সত্যি বনেদী বংশের বংশধর সেটা পাড়ার লোককে মনে করিয়ে দিতে বড় কর্তা কখনও কুণ্ঠিত হন না।

ঢং-ঢং-ঢং-ঢং ঢং !! দমকলের আওয়াজ। কোথায় আবার আগুন লাগল ? দেখবার জন্য তাড়াতাড়ি বাইরে এসে দাঁড়ালাম।

এ কি ! দমকল যে এসে থামল ঠিক আমাদেরই পাড়ায়, আর সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রচণ্ড কোলাহলও শুনতে পাওয়া গেল।

ছুটে গিয়ে দেখি, ছোট তরফের কর্তা পাগলের মত বাইরে এসে চেঁচাচ্ছেন—জল—জল, জল।

কিন্তু কোথায় জল ? রাস্তার হাইড্রেনগুলো সব শুকনো, আর আগুন লেগেছে ওঁদের বাড়ির ওপরের তলায়। দমকলের কর্মীরা তাদের ট্যাঙ্কে যেটুকু জল ছিল তাই ছুঁড়তে লাগলেন হোস্‌পাইপ দিয়ে সেই আগুনের দিকে। কেউ কেউ লম্বা মই বার করে তাই বেয়ে উপরে উঠতে লাগলেন। সেই সঙ্গে খোঁজ চলতে লাগল

কোথায় পাওয়া যায়—পর্য্যাপ্ত জল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য পাওয়া গেল, কিন্তু ততক্ষণে আগুন যা করার করে ফেলেছে। ছোট তরফের বিরাট

লাইব্রেরীটি পুড়ে একেবারে ছাই হয়ে গেছে।

ছোট তরফের কর্তার মুখ থম্ থম্ করছে। চোখ টকটকে লাল। এতদিনের চেষ্টায় যা গড়ে উঠেছিল তা কিনা এভাবে নষ্ট হয়ে গেল! পাড়ার অনেকেই তাঁকে প্রবোধ দিচ্ছেন। বড় তরফের বড় কর্তাও এসেছেন। তিনিও ওর মাথায় হাত দিয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। বলছেন —বিপিন, যা হয়ে গেছে তার জন্য মন খারাপ কর না। এসব পুঁথিপত্র ঘাঁটাঘাঁটি আমাদের বংশের কাজ তো নয়! আমাদের হল রাজবংশ, এর চালচলন আলাদা। তুমি তা মানো নি, তাই হয়তো ভগবান এমনি ভাবে দেখিয়ে দিলেন যে এ আমাদের কাজ নয়।

কিন্তু এত সহজেই কি সান্ত্বনা পাওয়া যায়?

যাই হোক, খানিক পরে দমকল চলে গেল। আগুনও ধিকি-ধিকি করে জ্বলতে জ্বলতে এক সময় নিভে এল। এবার আমরা কয়েকজন ধীরে ধীরে বিপিন বাবুর সঙ্গে ওপরে উঠে এলাম।

চারদিকে কাগজ পোড়া ছাই, আলমারীর পোড়া কাঠ। দেখলে আমাদেরই মন খারাপ হয়ে যায়, বিপিন বাবুর তো হবেই।

কিন্তু আগুনটা লাগল কি করে? বিদ্যুতের তারগুলো নতুন বসানো হয়েছে এবং খুব সুরক্ষিত ভাবেই বসানো হয়েছে বড় কোম্পানীকে দিয়ে। সেখানে যে শর্ট সার্কিট হয়ে আগুন লাগবে এ হতেই পারে না। ঘরের আশেপাশে আগুন জ্বালাবার কোন ব্যবস্থাই নেই। তার উপর দিনের বেলা লোড শেডিং হলে এবং রাতের বেলা হলে না হয় মোমবাতি জ্বলতে পারত। তাও তো নয়। বিপিনবাবু সিগারেট—টিগারেট কিছু খান না, তাঁর অনুমতি ছাড়া কারো ও ঘরে ঢোকাও নিষেধ। তবে? সত্যিই, এটা যেন একটা রহস্যজনক ব্যাপার।

তা রহস্যজনক হোক আর নাই হোক, বিপিন বাবু কিন্তু ব্যাপারটা ভালো করে তদন্ত না করিয়ে ছেড়ে দিতে রাজী হলেন না। পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগে এ সম্পর্কে আর্জি পেশ করলেন।

এসব ব্যক্তিগত ব্যাপারে পুলিশ হয়তো সব সময়ে তেমন আগ্রহ দেখায় না, কিন্তু শিখিধ্বজের কানে খবরটা পৌঁছতেই সে বড় সাহেবের কাছে গিয়ে বলল,—আমার ওপর ভার দিন, দেখি এ রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারি কিনা।

বড় সাহেব হেসে বললেন,—দেখ, তোমার তো আজব শখের অভাব নেই।

আমি যে ও পাড়ায় থাকি বিটু, থুড়ি শিখিধ্বজ তো তা জানতোই। তদন্ত শুরু করার আগে তাই সে প্রথমেই চলে এল আমার কাছে। উকিলের মত আমাকেও একটু জেরা করল, তারপর চলল ছোট তরফের বাড়িতে। আমাকেও অনুরোধ করল সঙ্গে যেতে।

গেলাম। কৌতূহল আমারও একটু ছিল। দেখলাম ও খুব খুঁটিনাটি করে অনেক কিছু দেখছে, যা দেখবার কোন কারণ আছে বলে আমার মাথায় এল না।

ঘরটা তখনও পরিষ্কার করা হয় নি। পোড়া জঞ্জাল সব ঘরের মধ্যেই তেমনি জড় হয়ে আছে—অগ্নিকাণ্ডের পর ইচ্ছে করেই সরানো হয়নি। শিখিধ্বজ সেই পোড়া কাগজ আর পোড়া কাঠের স্তূপের নানা জায়গায় গিয়ে সাবধানে খানিকটা করে তুলে নিয়ে লেন্স দিয়ে দেখতে লাগল। তারপর, কি মনে করে, তারই খানিকটা নিয়ে অতি সন্তর্পণে একটা ছোট প্লাষ্টিকের থলির মধ্যে ভরে নিল। পরীক্ষা শেষ হলে বলল,—আচ্ছা, আজ আসি। এবার ঘরটা সাফ করে ফেলতে পারেন।

পরদিনই শিখিধ্বজ আবার এসে হাজির। আজও আমাকে পাকড়াও করে নিয়ে এল বিপিন বাবুর বাড়িতে। আমি বললাম,—আরে আমি তো তোর অ্যাসিস্ট্যান্ট নই, আমি গিয়ে কি করব? ও হেসে বলল, "তবু চল্‌ই না। তুই তো পাড়ার লোক।"

আচ্ছা, আপনার এ ঘরের মেঝেতে কি খড়টড় কিছু বিছিয়ে রেখেছিলেন?—সরাসরি বিপিন বাবুকে প্রশ্ন করল শিখিধ্বজ।

বিপিনবাবু একটু চমকে বললেন,—না, মানে হ্যাঁ, খড় অর্থাৎ গোড়ায় খড়ই বিছোবার ব্যবস্থা করেছিলাম এই শেল্‌ফ্‌টার নীচে খানিকটা। কারণ ওর ওপর কতকগুলো খুব পুরনো পুঁথিপত্তর আছে। ঝাড়-পোছের সময় কোন কারণে হাত ফস্কে পড়ে গেলে মার্বেলের মেঝেতে পড়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে না যায়, পাতাগুলি ভারি মুচ-মুচে হয়ে গেছে কিনা! কিন্তু বুঝছেন তো, খড় বিছানো দেখতে ভারি বিশ্রী লাগে, এ ঘরের সঙ্গে একদম মানায় না। তাই বড়দা হঠাৎ একদিন এসে বলেছিলেন,—খড় বিছিয়েছিস কেন? খুব ভালো এক রকম ঘাসের মত গাছ আছে, ঠিক রেশমের মত দেখতে। পুরু। পেতে দিলে ঠিক কার্পেট বলে ভুল হয়। তাই এনে পুরু করে বিছিয়ে দে। দেখতেও চমৎকার হবে আর তোর কাজও উদ্ধার হবে। জিজ্ঞেস করেছিলাম,—কি নাম সে ঘাসের?

দাদা বললেন, নামটা মনে নেই। একটা বিদঘুটে ল্যাটিন নাম। আচ্ছা, আমিই না হয় যোগাড় করে এনে দেব আমার এক বিলিতী বন্ধুর কাছ থেকে। তিনিই এনে দিয়েছিলেন! সত্যি চমৎকার দেখতে। তারই খানিকটা পাতা ছিল। কেউ যেন খানিকটা রেশমী কার্পেট বিছিয়ে রেখেছে।

—হুঁ। তাছাড়া শুকনো খটখটে নিশ্চয়ই? কিন্তু কতদিন আগে পেতেছিলেন? রঙ চটে যাচ্ছিল না?

—হ্যাঁ, প্রথমে যেমন গাঢ় সবুজ ছিল পরে তা একটু ম্যাটমেটে দেখাচ্ছিল। বড়দার সেই বন্ধু বলে পাঠালেন, মাঝে মাঝে একটু জল ছিটিয়ে ভিজে ভিজে করে রাখতে। তাতে রং জ্বলে যাবে না। দেখলাম ঠিক তাই।

—কিন্তু ভিজে কার্পেটের উপর বই বা পুঁথি পড়লে সে বই বা পুঁথিও তো ভিজে নষ্ট হবে।

—না না, ততটা ভিজে নয়। যাকে বলে একটু স্যাঁৎসেঁতে। ঘাসে শিশির পড়ার খানিকটা পরে যেমন হয়।

—হুঁ। আপনার বড়দা মানে ঐ বড় তরফের মহিমবাবু তো?

উনি প্রায়ই আসেন বুঝি ?

—না না ক্বচিৎ কখনও আসেন। শুধু জ্ঞাতি তো! তা ছাড়া বুঝতেই তো পারছেন শরিকী সম্পর্ক—

বিপিনবাবু কথাটা শেষ না করলেও যে ইঙ্গিত করলেন তাতেই কথাটা বোঝা গেল। অর্থাৎ মুখে হৃদ্যতা দেখালেও ভেতরে কেউ কাউকে হয়তো পছন্দ করেন না।

মামলা-মোকদ্দমাও চলছে নাকি ?—হেসে, চোখটা একটু টেনে শিখিধ্বজ প্রশ্ন করল।

—না, এখন আর নেই। তবে একটা মামলা চলেছিল বেশ কিছুদিন। তাতে উনি—

—হেরে যান, তাই তো ?

—হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন। তবে এখন আর উনি সে সব মনে করে রাখেন নি।

—তাই মনে হয় ? ঠিক আছে, কাল দেখা হবে। চলি।

পরদিন। অনেক দিন পরে শিখিধ্বজকে পেয়েছি। এই সুযোগে তার কাছ থেকে গোটা কয়েক জরুরি কথা জেনে নেব ভাবছিলাম। তার বাড়ি গিয়ে শুনলাম সে আগেই অফিসে চলে গেছে। তাহলে কি অফিসেই যাব, কিন্তু গোয়েন্দা অফিসে যাওয়াটা কি ঠিক হবে ? পরক্ষণেই মনে হল, আমি তো তার সঙ্গে অন্য বিষয়ে ছুটো কথা বলতে চাই। দেখা করতে না চায় ফিরে এলেই হবে।

তাই করলাম। একটু পরেই ডাক এল। শিখিধ্বজের ঘরে গিয়ে দেখি, অবাক কাণ্ড! সামনের একটা চেয়ারে বড় তরফের মহিমবাবু ছুজন পুলিশ-বেষ্টিত হয়ে বসে আছেন। আমাকে দেখে অল্প দূরে আর একটা চেয়ারে বসতে বলে শিখিধ্বজ বলল,—একটু বোস্, এর সঙ্গে কথাটা সেরে নিই। এঁকে চিনিস নিশ্চয়ই ?

থতমত খেয়ে ঘাড় নাড়লাম। তারপর গুটিগুটি চেয়ারটায় গিয়ে বসলাম।

হঠাৎ শিখিধ্বজ সেইরকম পুলিশী ভঙ্গীতে মহিমবাবুকে প্রশ্ন

করল, ঐ রেশমী ঘাসগুলো কোথায় পেয়েছিলেন? আর বিপিনবাবুর ঘরে ওগুলো বিছোবার জন্যে অত ব্যস্ত হয়েছিলেন কেন?

—দেখতে ভালো লাগবে বলে? ও তো সম্পর্কে আমার জ্ঞাতি ভাই।

—দেখতে ভালো লাগবে বলে? নাকি মোকদ্দমায় হেরে যাবার প্রতিশোধ নিতে? ঠিক করে বলুন কে এ পরামর্শ দিয়েছিল।

—আমি নিজেই—

—ফের বাজে কথা? আপনি এ গাছের নাম আগে জানতেন? এর চেহারা দেখেছিলেন কখনও? আপনার সেই বিলিতী বন্ধুটি, যিনি এ পরামর্শ দিয়েছিলেন, তাঁকেও যে আমরা ধরে এনেছি। পাশের ঘরে অপেক্ষা করছেন তিনি। আপনার সঙ্গে কথা হয়ে গেলে ওঁকে ডাকব।

চোখ ফিরিয়ে দেখি মহিমবাবুর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

পরক্ষণেই শিখিধ্বজ যেন গর্জন করে উঠল,—আপনার লজ্জা করল না? একটা লোক এত পরিশ্রম করে এত দুষ্প্রাপ্য বই-এর একটা লাইব্রেরী গড়ে তুলেছে, নিজের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে সেই লাইব্রেরীতে আগুন লাগিয়ে দিতে!

আগুন! ঘাস বিছিয়ে আগুন!—মহিমবাবু আশ্চর্য হবার ভঙ্গী করলেন।

হ্যাঁ, ঠিক তাই। আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারেন নি। গোয়েন্দা হলেও আমি বিজ্ঞানের ছাত্র, আর ঐ সব গাছপালার বিজ্ঞানই আমার বিশেষ সাবজেক্ট। ঐ ঘাসগুলো এদেশে হয় না। ওগুলো 'হে' জাতীয় একরকম বিশেষ ধরণের ঘাস। দেখতে ঠিক রেশমের মত, বৈজ্ঞানিক নাম গ্রামিনি ফাইবারিয়া সিল্‌কিয়া। বাকিটুকু বলব? থাক, আপনার সেই বিলিতী বন্ধুর কাছ থেকেই স্বীকারোক্তিটা শোনা যাবে। আপনি ততক্ষণ বরঞ্চ একটু ও ঘরে গিয়ে বসুন।—বলে শিখিধ্বজ পুলিশ দুটিকে ইঙ্গিত জানাল।

মহিমবাবু চলে গেলে শিখিধ্বজের দিকে তাকিয়ে আমি বললাম,

—তুই জেরা কর, আমি না হয় আজ আসি ?

শিখিধ্বজ আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল,—না না, যাস নে। মহিমবাবুর ঐ বিলিতী বন্ধুটিকে একটু জেরা করে নিই, তারপর তোকে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলব। তুই বরং বারান্দার চেয়ারটায় একটু বোস। মিনিট তিন চার। মনে হচ্ছে রহস্যটা ধরে ফেলেছি।

তিন-চার মিনিট পরে শিখিধ্বজের ডাকে আবার ভিতরে চলে এলাম, জেরা শেষ হয়ে গেছে। ঘরে আর কেউ নেই। শিখিধ্বজ দু'কাপ চা আনতে বলে বলল,—ভারি অদ্ভুত কেস্। তোকে একটু বুঝিয়ে বলি। তুই তো আবার গল্প লিখিস।

গ্রামিনি ফাইবারিয়া সিল্কিয়া হচ্ছে এক রকম বিশেষ জাতের ঘাস, দেখতে ভারি সুন্দর। কিন্তু এগুলির মধ্যে নানা জাতের ব্যাকৃটিরিয়া খুব সহজেই জন্মাতে পারে—বিশেষ করে যদি এগুলো একটু ভিজে ভিজে থাকে। ব্যাক্‌টিরিয়াগুলো, বলা বাহুল্য, খুবই খুদে - যাকে আমরা বলি আনুবীক্ষণিক। কিন্তু তা হলেও ওরাও তো সজীব অর্থাৎ জ্যান্ত পদার্থ, তাই এদেরকেও শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে হয়। এখন তুই তো নিশ্চয়ই জানিস, মোটামুটি দু'জাতের ব্যাকটিরিয়া আছে যাদের একদল বাতাস থেকে অক্সিজেন টেনে নেয়। এদেরকে বলা হয় এরোবিক ব্যাক্‌টিরিয়া। অন্যদলের নিশ্বাস নিতে অক্সিজেন লাগেই না। তাদেরকে বলা হয় অ্যানেরোধক ব্যাক্‌টিরিয়া। এখন, এই দুই জাতের ব্যাক্‌টিরিয়াই এই জাতের ঘাসে খুব সহজে জন্মায়। শ্বাস প্রশ্বাস নিতে হলে,—তা সে অক্সিজেন নিয়েই হোক আর না নিয়েই হোক—খানিকটা শক্তি, যাকে বিজ্ঞানীরা বলেন 'এনার্জি' তৈরী হবেই। আমরা এগুলিকে বলি রাসায়নিক শক্তি। শুধু রাসায়নিক শক্তিই নয়, ও থেকে খানিকটা তাপশক্তিরও সৃষ্টি হয়। এই ঘাসের ব্যাক্‌টিরিয়াগুলোও শ্বাস-প্রশ্বাস নেবার সময় ঐ তাপশক্তি বার করে দিতে পারে। আর, যদি একটু ভিজে ভিজে—স্যাঁৎসেঁতে আবহাওয়া পায়, তাহলে এরা খুব দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে। আর ঐ রকম দ্রুত বংশবৃদ্ধি হলে সবাই মিলে যে তাপ বার করতে থাকে তা সময়

সময় এত বেশি হয় যে তা থেকে সমস্ত ঘাসগুলোতেই আগুন জ্বলে উঠতে পারে—আপনা আপনিই।

ছোট তরফের কাছে মামলায় হেরে গিয়ে মহিমবাবু যখন কি করে ওদের অনিষ্ট করবেন ভাবছেন তখন তাঁর এই বিলিতী বন্ধুটি, নিশ্চয়ই তিনিও একজন বিজ্ঞানী, তাঁকে এই পরামর্শটি দিয়েছিলেন। বিপিনবাবু যে পুরোনো পুঁথিপত্তর বাঁচাবার জন্য ঘরে খানিকটা খড় পেতে রেখেছেন সে খবর মহিমবাবু জেনেছিলেন এবং ওকেও বলেছিলেন। ঐ বিশেষ জাতের রেশমী ঘাস বিলিতী বন্ধুটির মারফৎ আনিয়ে তিনি বিপিনবাবুর ঘরে পুরু করে পাতবার ব্যবস্থা করে এলেন। আর তাড়াতাড়ি কার্য সিদ্ধির জন্য ঘাসগুলোকে জল ছিটিয়ে স্যাঁতসেঁতে করে রাখবার পরামর্শ দিয়ে এলেন। লেন্স দিয়ে পোড়া ছাই পরীক্ষা করবার সময়ে আমি পোড়া বই আর পোড়া কাঠের মধ্যে কিছু সূক্ষ্ম সুতোর মত জিনিস লক্ষ্য করেছিলাম। তাই থেকেই আমার কেমন সন্দেহ হল। তারপর তারই খানিকটা সংগ্রহ করে এনে মাইক্রস্‌কোপের নীচে ফেলতেই আসল রহস্য বেরিয়ে পড়ল। এমন কি কিছু কিছু আধ-পোড়া ঘাসে তখনও কিছু কিছু ব্যাক্‌টিরিয়া মরে নি। তখনই আঁচ করলাম, এ অগ্নিকাণ্ড নিশ্চয়ই ইচ্ছাকৃত এবং কারও কারসাজি—যে নাকি বিপিনবাবুর অনিষ্ট করতে চায়। কথায় কথায় মহিমবাবুর পরামর্শের কথা জেনে নিলাম। তারপরই ডেকে আনবার ব্যবস্থা করলাম মহিমবাবু ও তাঁর পরামর্শদাতা বন্ধুটিকে গোয়েন্দা অফিসে। পুলিশী জেরার চাপে তাঁরা আর আসল কথা চেপে রাখতে পারলেন না।

নে চা-টা খেয়ে নে, ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।—কাহিনী শেষ করে বিটু খুড়ি শিখিধ্বজ চায়ের কাপে একটা দীর্ঘ চুমুক লাগাল।

সোনা-রূপোর কদম ফুল

নবনীতা দেব সেন

এক দেশে এক রাজপুত্তুর আছেন।

রাজপুত্তুরের বাবা নেই, মা নেই, ভাই নেই, বোন নেই। কেবল এক ধাইমা, আর এক মন্ত্রীমশাই। তুজনেই বুড়ো থুত্থুড়ে হয়েছেন। তুজনেই তাঁর ঠাকুর্দাদার আমলের মানুষ কিনা।

ছোট্ট রাজপুত্তুর একলা একলাই খেলে বেড়ান রাজপ্রাসাদের মস্ত মস্ত মর্মর পাথরের ঘরে, শাদাকালো চৌকো রুইতনের মতন পাথর সাজানো বিরাট বারান্দায়, পরীর মূর্তি বসানো ফোয়ারার ধারে বাহাত্তর রকমের গোলাপ ফুলের বাগিচায়, ফলের ভারে নুয়ে পড়া আম বনে. জাম বনে, আপেল বনে, ডালিম বনে। রাজপুত্তুর একা একাই নৌকো চালান নীল মেঝেওলা গোলাপগন্ধী হাঁটু পর্যন্ত জল ভরা, লাল নীল মাছ সাঁৎরানো চমৎকার লম্বা-চওড়া চৌবাচ্চায়, হঠাৎ দেখলে মনে হবে বুঝি বা নদীই! রাজপুত্তুর একা একাই ধনুর্বাণ নিয়ে খেলা করেন, অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ শিখে গেছেন তিনি। খেলার সঙ্গী তাঁর কেউ নেই। মন্ত্রীপুত্তুর নেই, কোটালপুত্তুর নেই, সদাগরপুত্তুর নেই। কী করে থাকবে? সে দেশের কোটালই নেই, সে দেশের সদাগরই নেই। রাজাই তো নেই। সবাই একসঙ্গে সেই যে বেরিয়ে গেছেন প্রায় দেড়যুগ আগে, সোনারূপোর কদমফুল আনতে. আর ফিরে আসেন নি। দেশের লোকের তাই মনে খুব তুঃখু।

রাজামশাই সেই যে গেলেন আর ফিরলেন না। এদিকে বৌরাণীর কোলে একটি দেশ-আলো-করা রাজপুত্তুর এলো। রাজা-মশাইয়ের মা, মহারাণীমা, ছেলের শোক ভুলতে নাতিকে কোলে

তুলে নিলেন। ইতিমধ্যে কী যে হোলো একদিন পূজোর সময়ে, আকাশে নীল রোদ হাসছে, এলাচি নদীতে স্নান করতে গিয়ে মহারাণীমা আর বৌরাণী, দুজনেই উধাও। দাসীরা কেউ তাঁদের খুঁজেই পেলে না। ঝড় নেই, ঝঞ্ঝা নেই কোথায় গেলেন তাঁরা? দেশে নতুন করে শোকের ছায়া ঘনালো, পূজোর আকাশ, পূজোর বাজনা, সব মিথ্যে হয়ে গেলো। ধাইমা তখন চোখের জলে রাজপুত্তুরকে বুকে তুলে নিলেন। আর বৃদ্ধ মন্ত্রীমশাই তুলে নিলেন অগত্যা রাজদণ্ডটি। রাজপুত্তুর বড়ো হলে, সেটি তাঁর হাতে ধরিয়ে দিয়ে তবে তাঁর ছুটি।

কতো সাধু সন্নিসি এলো-গেলো, কতো জ্যোতিষী গণৎকার গুণলো দেখলো, অঙ্ক কষলো, কেউই সঠিক সংবাদ দিতে পারলে না। দেশের লোকের চোখের জল একদিন শুকিয়ে গেল। রাজারাণীর কথা তারা একেবারে ভুললেনা বটে, কিন্তু সেসব মানুষগুলো আস্তে আস্তে গল্পকথা হয়ে গেলো। মন্ত্রীমশায়েরও বুক খালি। কোটাল, সদাগর, মন্ত্রী, রাজা এই চার বন্ধুতে বেরিয়েছিলেন। কেউই ফেরেননি। আর কী করা? মন্ত্রীর বাবা বৃদ্ধ মন্ত্রীকেই ডেকে পাঠিয়ে মহারাণীমা রাজ্যশাসন করছিলেন। সেই মহারাণীমাও তো গেলেন। কচি বৌরাণী সুদ্ধু। বৃদ্ধ মন্ত্রী কিছুই ভুলতে পারেন নি। তিনি অশেষ ধৈর্যে, প্রতীক্ষায় আছেন। রাজপুত্তুর কবে বড়ো হবেন, তাঁর হাতে রাজদণ্ডটি তুলে দিয়ে তিনি তীর্থে বেরিয়ে পড়বেন। ছেলেদের খোঁজে যাবেন। গেল কোথায় চার চারজন টাটকা তাজা টগবগে পক্ষীরাজ ঘোড়ার মতন যুবক ছেলে? বৃদ্ধ মন্ত্রীর বুকের ভেতর গুমরে গুমরে কষ্ট হয়।

রাজপুত্তুর এদিকে বড়ো হচ্ছেন। তীরধনুক যেমন চালাতে পারেন, তেমনিই খেলাতে পারেন ঝকঝকে তরওয়াল, পারেন প্রায়-বুনো ঘোড়ার পিঠে চড়ে, তাকে বশ মানাতে। রাজপুত্তুরকে রাজ পণ্ডিত প্রত্যহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়েছেন। রাজপুত্তুর গুণীকে সমাদর করতে, দুর্বলকে রক্ষা করতে আর দোষীকে সাজা দিতেও শিখে

গেছেন। মন্ত্রী ভাবলেন—'আর কি? প্রাপ্তে তু ষোড়শবর্ষে'—ষোলো তো হোলো, রাজপুত্তুরকে এবার রাজা করে দিই। ভেবে, রাজপণ্ডিতকে ডাকলেন দিনক্ষণ ঠিক করতে। রাজপণ্ডিত ছক্‌টক্ পেতে লগ্নাগ্ন গুণে গেঁথে বললেন—'নাঃ, এখন তো রাজপুত্তুরের রাজা হবার কথা নয়। এখন তাঁর দীর্ঘ বিদেশভ্রমণে বেরুনোর কথা। রাজপুত্তুরের সামনেই সমুদ্রযাত্রা।'

—'সে কি? সে কি? সমুদ্রযাত্রা করে যাবেন কোথায়? কোন্ বিদেশে? এই জম্বুদ্বীপের চেয়ে আরো ভালো দেশ আর আছে নাকি?'

'—রাজপুত্তুরকে যেতে হবে দারুচিনিদ্বীপের পাশে লবঙ্গদ্বীপে, পান্না সাগরের মোহানায়। যেখানে রক্তচূনীর পাহাড়টি সোনারূপোর কদম্ববন ঘিরে আছে। একটি কদমফুল চাইই।'

—'কিন্তু সে যে বড়ো ভয়ঙ্কর দেশ! সে যে বড়ো মৃত্যুময় গহীন গাঙ্‌ পেরিয়ে যাওয়া। একবার মায়া অরণ্যে পথ হারালে, বাপের মতোই পুত্রেরও আর ফেরা হবে না। না। থাক, ছেলেমানুষ রাজপুত্রের গিয়ে কাজ নেই।' মন্ত্রীমশাই বাদ সাধলেন। সিংহাসনে বসতে হলে কিন্তু কদমফুল আনতেই হবে। সেই ফুলে পূজো দিতে হবে কালভৈরবের। পিতৃসত্য অরক্ষিত রয়েছে যে! রাজা হবেন কী করে?

ধাইমা কেঁদে পড়লেন—'দরকার নেই বাছা তোর রাজা হয়ে। সারাজীবন না হয় যুবরাজই হয়ে রইলি। সেই ভয়ঙ্কর মায়া অরণ্যে তোমার গিয়ে কাজ নেই, বরং মিষ্টি দেখে বুদ্ধিমতী কোনো রাজকন্যেকে বৌ করে এনে দিই। ঘর সংসার করো। রাজ্যপাট চালান মন্ত্রীমশাই। সোনারূপোর কদমফুলে নজর দিয়ে কাজ নেই, থাক্‌না সে আপনমনে ফুটে, রক্তচুনীর পাহাড় আলো করুক।'

কিন্তু ক্ষতি যা হবার তা হয়ে গেছে।

রাজপুত্তুরের রক্তের মধ্যে যেন শিকারের শিঙা ফুঁকে দিয়েছে, বুকের মধ্যে যেন কাড়ানাকাড়ার বাদ্যি বাজিয়ে দিয়েছে। যাত্রার

ডাকে রাজপুত্তুর উথালপাথাল, অস্থির চঞ্চল। না বেরুলে আর শান্তি কৈ? কোথায় আছো হে সোনারূপোর কদমফুল? ধরা দাও, দেখা দাও। আমি আসছি তোমাকে খুঁজতে। আমাকে এড়িয়ে পালিয়োনা যেন! এই এলুম বলে, পিতৃসত্য রক্ষা করা চাই-ই চাই।

পণ্ডিতমশাই বলেছেন, পিতৃসত্য রক্ষা না করে তো রাজ্যপাটে বসতে পারেন না রাজপুত্র! রাজামশাই কালভৈরবের মন্দিরে সোনারূপোর কদমফুল মানত করেছিলেন, তাই অতবড় দেশজোড়া মড়কটা সেবার বন্ধ হয়েছিল। সেই মানত এখনও রক্ষা হয়নি। রাজসিংহাসনে তো বসা হবে না! আগে ফুল চাই।

কারুর কোনো কথা না শুনে রাজপুত্তুর তৈরি হলেন। বেরুবেন তিনি এবার সোনারূপোর কদমফুলের খোঁজে। 'ফুল না নিয়ে ফিরবো না—' প্রতিজ্ঞা শুনেই ধাইমা চোখে আঁচল চেপে লুটিয়ে পড়লেন মেঝেতে। আর মন্ত্রীমশাই বুকটা চেপে ধরে ছাদে পায়চারি করতে লাগলেন। কেবল পণ্ডিত বললেন—'মা ভৈঃ। তোমার ঠাকুর্দার মৃত্যুর কিছুকাল পরে কাল অশৌচের মধ্যেই তোমার বাবা জেদ করে শুভকাজে রওনা হয়েছিলেন। তিনি তাই বংশের দৈব কবচে হাত ছোঁয়াতে পারেন নি। তোমার তো সে ভাবনা নেই। বুকে পরো সর্বসিদ্ধি কবচ, আর কাঁধে থাকুক তোমার প্রিয় বাজপাখি 'শ্যেনদেব।' বাস্ আর কিসের ভাবনা তোমার? তোমার নিজের পোষ মানানো ঘোড়া, 'মারুতিই' তোমাকে নিয়ে যাবে হীরকবন্দরে। সেখান থেকে তো শুধু এলাচি নদীর মোহানা পার হওয়া আর লবঙ্গ-দ্বীপে পৌছানো। এটুকু আর তুমি পারবে না? নিশ্চয় পারবে।'

—'তবে বাবামশাই কেন...?'

—তাঁর সঙ্গে তো এসব দৈব অস্ত্রশস্ত্র ছিল না। দেবতাদের অমান্য করে তিনি গিয়েছিলেন পুরুষকার নির্ভর করে, কিন্তু তুমি হবে নির্বৈর। ফুল এনে কালভৈরবের মন্দিরে পূজো দিয়ে পিতৃসত্য পূর্ণ করলেই রাজমুকুট পরিয়ে দেব আমরা তোমার মাথায়।'

শুভদিনের শুভলগ্নে, ভোর হতে না হতে রাজ্যের এয়োস্ত্রীরা শাঁখ

বাজালেন, উলু দিলেন। রাজপ্রাসাদে নহবৎখানায় শানাই বাজলো। ধাইমাকে, মন্ত্রীমশাইকে, রাজপণ্ডিতকে প্রণাম করে রাজপুত্তুর রওনা হলেন লবঙ্গ দ্বীপের দিকে। ভোরের আলো তাঁকে পথ দেখালো।

পথ তো নাকের সোজা। লালে শাদায় আলপনা আঁকা আশ্চর্য সুন্দর ঘোড়া মারুতি, যেন হাওয়ার বেগেই ছুটলো। কাঁধের ওপর বাজপাখিটি বাঁকা নোখ দিয়ে বর্ম আঁকড়ে বসে আছে। সোনালী উষ্ণীষ উড়ছে। রাজপুত্রকে যতক্ষণ দেখা গেল ধাইমা তাঁর বাতায়ন থেকে চেয়ে রইলেন। তারপর চোখে আঁচল চেপে, পূজোর ঘরে গিয়ে শ্বেতপাথরের মেঝেয় আছড়ে পড়লেন রাজবংশের কুলদেবতার সামনে। মন্ত্রীমশাই আর পণ্ডিতমশাই ফিরে গেলেন রাজসভায়। সভার কাজ স্বরু হবে এবার। তাঁদের তো শুয়ে পড়লে চলবে না। পণ্ডিতমশাই হাসিমুখে আছেন। মন্ত্রীমশায়ের মুখ যেন কাল বোশেখীর আকাশ। আবার সেই অলক্ষুণে সোনারূপোর কদমফুল! কী কুক্ষণেই যে মানতটা করা হয়েছিল। এসব মানত টানত করাই আর উচিত নয়, বড় অবৈজ্ঞানিক কাণ্ডকারখানা ভাবলেন মন্ত্রীমশাই 'মানত অবৈধ করে একটা আইন চালু করতে হবে দেখছি!'

ওদিকে মারুতি উড়তে উড়তে, না ছুটতে ছুটতে, চলেছে। ক্ষেত খামার, জল জঙ্গল, বন পাহাড়ী, গাঁগঞ্জ, হাটবাজার,—যাবার পথে কতো কী পড়ে। সবাই হাতের কাজ বন্ধ করে থেমে দাঁড়ায়। ছাখে রাজপুত্র চলেছেন, সোনালী উষ্ণীষে সূর্যের আলো পড়ে ঝলসে উঠছে, চমক দিচ্ছে তরোয়ালের হীরে মোতি, ঝলক দিচ্ছে সর্বসিদ্ধি কবচের ইস্পাত। শ্যেনদেব কখনো কাঁধে বসে আছে। কখনো কখনো উড়ছে মাথার ওপর দিয়ে।

সন্ধ্যে যখন নামে নামে, রাজপুত্র দেখলেন হীরকবন্দর এসে গেছে। সামনে সারি সারি সদাগরী জাহাজ হীরের বেসাতি নিয়ে খাড়া। দেখলেন পান্নাসাগরের রং ঠিক পান্নার মতোই সবুজ আর এলাচি নদীর স্বচ্ছ জল ছোট এলাচের মতন শাদা—মোহানায় দুয়ে মিলে কী চমৎকার বেনীবন্ধন হয়েছে। দেখে রাজপুত্রের চোখ জুড়িয়ে গেল।

কিন্তু কই ? দ্বীপ কোথায় ? যতদূর চোখ যায় জল, শুধু জল। কোনো দ্বীপ টিপের চিহ্ন নেই। অথচ থাকার কথা একটি নয়—একজোড়া দ্বীপের। দারুচিনি দ্বীপের পাশে লবঙ্গদ্বীপ। সেইখানে আছে রক্তচুনীর পাহাড় আর তাতে কদম্ববনে সোনারূপোর কদমফুল ফুটে আছে। কিন্তু সামনে চাও, ডাইনে চাও, বাঁয়ে চাও, জল শুধু জল। দ্বীপ কই ?

—'শ্যেনদেব ?' রাজপুত্তুর বললেন, 'তুমি দ্বীপ দেখতে পাচ্ছো ভাই ?'

শ্যেনদেবের দৃষ্টি বড় তীক্ষ্ণ, বড় সুদূর প্রসারী। সে বললে, 'দাঁড়াও, তবে উপরে উঠে যাই।' বলেই সে গোঁত্তা মেরে ঘুড়ির মতো উড়ে গেল। মেঘটেঘ ছাড়িয়ে সেই কোন অসীম শূন্যে। তাকে আর দেখাই গেল না। কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আবার শ্যেনদেব নেমে এসে রাজপুত্রের কাঁধে বসে বললে—'হ্যাঁ, দ্বীপ আছে। কিন্তু জলের তলায়।'

—'জলের তলায় ? সে আবার কেমন দ্বীপ ভাই ? দ্বীপের তো চতুর্দিকে জলবেষ্টিত হয়ে থাকার কথা। জলের নিচে লুকিয়ে থাকার কথা তো নয় ?'

শ্যেনদেব বললে—'হয় তো এখন জোয়ার। এরকম মোহানার অনেক দ্বীপই ভাঁটায় ভেসে ওঠে, জোয়ারে ডুবে যায়। দেখি ভাঁটার টানে জেগে ওঠে কিনা, উঠলেও দূর আছে কিন্তু ঢের।'

রাজপুত্রের খিদে পেয়েছিল, তিনি তাই মারুতিকে ছেড়ে দিলেন, চমৎকার ঘাসের জমি রয়েছে পাশেই, মারুতি পেট ভরে খাক। তাঁর সঙ্গে টিফিন আছে, ধাইমার দেওয়া লুচিমণ্ডা। রাজপুত্র তাই খেয়ে, এলাচি নদীর মিঠে জলে তৃষ্ণা মেটালেন। আঃ, কী মিষ্টি জল, যেন সত্যিই এলাচের সুবাস তাতে। এত চমৎকার আমার দেশ ! এসব তো জানাই হোতো না, যদি সোনারূপোর কদমফুল আনতে না বেরুতাম ? ভেবে রাজপুত্র খুশি হয়ে উঠলেন। শ্যেনদেবও ততক্ষণে ফলটল খেয়ে পেট ভরিয়ে এসেছে। সে বললে, 'রাজপুত্র, ধরো দ্বীপ

জেগে উঠলো। কিন্তু তুমি সেখানে যাবে কেমন করে? মারুতি তো পক্ষীরাজ নয় যে উড়ে পার হবে নদী সাগর? আর আমি তো এই এতটুকুন, তোমাকে তো আর কাঁধে নিতে পারবো না? এখানে জলে জলে বিনুনী বাঁধা, বড়ই অনিশ্চয়, উত্তাল এর স্রোত—সাঁতরে পার হওয়াও অসম্ভব। কী করবে, ভাবো। সামনেই তো সার সার জাহাজ। রাজপুত্র ভাবলেন ওদেরই একটিকে বলবেন—সওদাগর, আমাকে লবঙ্গদ্বীপে পৌঁছে দেবে? সে কি আর দেবে না?

কিন্তু কাছে গিয়ে দেখেন জাহাজ সবই বিদেশী নাবিকদের। তারা ওঁর প্রজা নয়, ওঁর অনুরোধ না মানতেও পারে। এমন ক্ষেত্রে অনুরোধ না করাই রাজপুত্রের উচিত কাজ। তাহলে?

এমন সময়ে ভাঁটা লাগলো। জাহাজগুলো সব পাড় থেকে দূরে সরে গেল, জল নেমে গেল অনেক নিচে, আর দূরে বহুদূরে ভেসে উঠলো পাশাপাশি দুটি দ্বীপের ছায়া। রাত তখন ঢের, আকাশে মাঝপক্ষের আধখানা চাঁদ, তার আলো আঁধারিতে দেখা গেল একটি বৃদ্ধ জেলে, কাঁধে জাল নিয়ে আপনমনে গান গাইতে গাইতে উঠে আসছে। রাজপুত্র বললেন—ভাই ধীবর, তোমার নৌকা নেই? তুমি কি ভাবে মাছ ধরতে যাও?

জেলেটি অবাক হয়ে রাজপুত্র দেখছিল। সে বললে—'আছে বৈকি, জেলে ডিঙি আছে আমার। তুমি কোন দেশের রাজপুত্তুর গো?' 'আমি তোমারই দেশের রাজপুত্র, ভাই।'

—অঃ মা গঃ। পেন্নাম হই রাজপুত্তুর মশাই! কী সোনার চাঁদ ছেলে! তা তুমি রাজধানী ছেড়ে এতদূরে কী করছ? তোমার সেপাই সান্ত্রী কই? লোকজন কই?

—সে সব তো সঙ্গে আনিনি, আমি যে সোনারূপোর কদমফুল নিতে এসেছি। আর এসেছি, আমার হারিয়ে যাওয়া বাবার খোঁজে।

—তোমার বাবা তো একা আসেননি রাজপুত্তুর, তাঁর সঙ্গে মন্ত্রী ছিল। কোটাল ছিল, সদাগর ছিল। তুমি এরকম একল্লাটি যে? তোমাকে একা ছাড়লে কে?

—আরে? তুমি জানলে কি করে ধীবর? বাবার সঙ্গে কে কে ছিলেন?

—আমি তো তাঁদের দেখেছিলুম। তাঁরা আমারই নৌকা চড়ে লবঙ্গদ্বীপে গিয়েছিলেন না?

—তারপর? তারপর? তারপর তাঁদের কী হোল তুমি জানো?

—না রাজপুত্তুর। আর আমি তাঁদের দেখতে পাইনি। অনেকবার নৌকা নিয়ে ফিরে ফিরে গেছি, যদি তাঁদের দেখা পাই, দেখা মেলেনি। তাঁরা যেন রক্তচুনীর পাহাড়ের গায়ে মিলিয়ে গেলেন।

—ধীবর ভাই, আমাকে নিয়ে যাবে, লবঙ্গদ্বীপে?

—কেন নিয়ে যাবো না? কিন্তু এখন তো ভাঁটা, জোয়ার আসুক, তখন নৌকো ভাসাবো।

—কিন্তু জোয়ারের সময়ে তো সে দ্বীপ থাকবে জলের নিচে।

—আমরা অপেক্ষা করবো, ভাঁটায় দ্বীপ যখন জেগে উঠবে তখন তুমি নামবে। আমিও কিন্তু তোমার সঙ্গে যাবো রাজপুত্তুর, একলাটি এমন সোনার চাঁদ ছেলেটাকে ছেড়ে দেবো না। মায়াঅরণ্যে কত ভয়ডর, কত ফাঁদ-ফন্দি। পাকামাথা একজন সঙ্গে থাকা ভাল।

মারুতি পা ঠুকে ঠুকে বললে ঠিক ঠিক।

শ্যেনদেব চিল্ চীৎকার করে বললে—ঠিক ঠিক। বৃদ্ধ জেলে তার বাড়ি থেকে কাজকর্ম সেরে ঠিক জোয়ারের সময়ে ফিরে এল। —'চল, রাজপুত্তুর, দুগ্‌গা বলে বেরিয়ে পড়ি।' রাজপুত্তুর বললেন—'চল। কালভৈরবকেও একবার স্মরণ করে নিই। তাঁর জন্যেই তো যাওয়া। সোনারূপোর কদমফুলে তাঁরই পূজো হবে। হে কালভৈরব তোমার ফুল তুমিই সংগ্রহ করে নাও আমার হাত দিয়ে।' বলে রাজপুত্তুর মারুতিকে তীরে রেখে, শ্যেনদেবকে কাঁধে নিয়ে নৌকোয় উঠলেন। সে কী ভয়ংকর যাত্রা! কী ঢেউ! কী স্রোত। আর বৃদ্ধ জেলের কী সাহস। কী শক্তি। আস্তে আস্তে এক জায়গায় এসে সে ভাঁটার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো।

এক সময়ে দেখা গেল একটি সুগন্ধী দারুচিনিগাছ জলের ওপরে ধীরে ধীরে মাথা তুলছে। আস্তে আস্তে ভেসে উঠলো পুরো দারুচিনিদ্বীপ। তার পাশে নৌকো নিয়ে চলল ধীবরভাই, সেখানে জলের ওপরে প্রথমে ভেসে উঠলো—কী বলো তো? একটি কদমগাছের মগডাল। তাতে বড় বড় জল চিক্‌চিক্ ঘনসবুজ পাতার

আড়ালে ঝক্‌ঝক্‌ করছে একটি সোনার নিটোল কদমফুল, যেন সূর্য উঠছে—তার ওপর ঝিরঝিরে রূপোর কেশরের ঝালর—যেইনা দেখা গেছে সেই কদমফুলটি, অমনি জেলে তার জাল ছুঁড়ে ফেলেছে ফুলের ওপরে, আর নৌকো তাড়াতাড়ি কাছে নিয়ে যেতে না যেতেই—শ্যেনদেব তক্ষুনি উড়ে গিয়ে শক্ত ঠোঁটে ভেঙে ফেলেছে ফুলের বোঁটা। এবারে ধীবর তার জালটি এক ঝাপটায় গুটিয়ে নৌকায় রাজপুত্রের কোলের ওপর এনে ফেললো সোনারূপোর দুর্লভ কদমফুলটি! সব ব্যাপারটা ভাল করে বোঝবার আগেই ভেসে উঠলো কদম্ববনে ঘেরা রক্তচুনীর পাহাড়সুদ্ধু লবঙ্গফুলের গন্ধে মাতাল করা লবঙ্গদ্বীপ। সেখানে প্রত্যেকটি গাছেই জড়িয়ে আছে লবঙ্গলতা, ঝরে পড়া লবঙ্গ-ফুলে ছেয়ে আছে ঘাস। কিন্তু মানুষজন নেই। কেউ কেন যায় না? সদাগরের লোভী নজর কেন পড়েনা সেখানে? লবঙ্গের দাম তো সোনার মতন। রাজপুত্তুর একেবারে মোহিত হয়ে গেছেন লবঙ্গ-ফুলের সুবাসে।

—'ধীবরভাই, চলো, নামি।'

—'নামবে কেন, রাজপুত্তুর? চলো, ফিরি। এই তো তোমার ফুল। আশ্চর্য ছ্যাখো, কত বচ্ছর এখানে আসছি, কদমগাছটিই শুধু উঠে আসে, দেখি। ফুলটি কখনো দেখিনি। আজ যেন তোমার হাতে ধরা দেবার জন্যেই ফুলটি দেখা দিয়েছে। আর ও দ্বীপে নেমে কাজ নেই। তোমার তো ফুল তোলা হয়ে গেছে। এবার ফেরো।'

—'কিন্তু বাবামশায়? মন্ত্রিমশাই? কোটালমশায়? সদাগর-মশাই? তাঁদের খোঁজ নিতে হবে না?'

—'আগে তো তুমি ফুলটা পৌঁছে দাও কালভৈরবের মন্দিরে। তারপরে ইচ্ছে করলে আবার বেরিও। এ ফুল নিয়ে ঘরে পৌঁছুনোও তো সোজা নয়? তোমার বাবাও ফুল তুলেছিলেন, কিন্তু ঘরে ফেরেননি।'

—'তুমি কী করে জানলে, বাবা ফুল তুলেছিলেন?'

—'অতশত প্রশ্ন কোরনা তো বাপু। অত উত্তর জানিনে আমরা মুখ্যু সুখ্যু মানুষ। আমাদের রাজামশাই মস্ত বীরপুরুষ —ফুল তোলেন নি কি আর? যা চাইতেন তা পেতেনই!

—লবঙ্গদ্বীপে সদাগররা ব্যবসা করেনা কেন ধীবরভাই? দারু-চিনি লবঙ্গের তো বিশ্বের হাটে অনেক দাম।

—বাবা রে! যত দামই হোক, প্রাণের চেয়ে তো বেশি নয়? বিদেশী সদাগররা মায়া অরণ্যে অনেকবারই গেছে লোভে পড়ে, কিন্তু প্রাণ নিয়ে কেউ ফেরেনি। তাই আর যায় না। হীরক সদাগররা বড় লোভী। ওদের সঙ্গে কথা বলে কাজ নেই। সোজা বাড়ি ফিরে যাও।'

—'কিন্তু আমাকে তো লবঙ্গদ্বীপে যেতেই হবে, বাবার জন্যে!'

—'পরে হবে। আগে পূজোটা দিয়ে এসো।' ডাঙ্গায় নামতেই মারুতি ছুটে এলো। রাজপুত্তুর উঠে বসলেন। বললেন, 'ধীবরভাই, আমি খুব শিগগিরই ফিরে আসছি। বাবাকে খুঁজে নিয়ে গিয়ে আমি সিংহাসনে বসাবো। আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ওঁরা মায়া অরণ্যেই আটকে আছেন।'

—'সামনের পূর্ণিমায় এসো তাহলে। নিয়ে যাবো।'

রাজ্যে কাঁসরঘণ্টা শাঁখ বাজছে, চারদিকে আনন্দ। কালভৈরবের মন্দিরের মানত রক্ষা হয়েছে। পিতৃসত্য রক্ষা করেছেন রাজপুত্র। কালভৈরবের সামনে মর্মরের ফুলদানিতে শোভা পাচ্ছে সোনা রূপোর কদম্বফুল। দেশে আহ্লাদের বান ডেকেছে। কেবল রাজপুত্রের মনেই আনন্দ নেই। কোথায় আমার মা? কোথায় আমার বাবা? আমার ঠাকুর্দাদা আমার ঠাকুমা? কোন্ অপরাধে আজ আমার কেউ কোথাও নেই? মনে মনে এইসব ভাবেন, আর ম্লান হয়ে যান। রাজপুত্রের অভিষেকের ব্যবস্থা হচ্ছে। মন্ত্রীর মুখে হাসি আর ধরে না, ধাইমার মুখে হাসি উপচে পড়ে। পরের পূর্ণিমায় রাজপুত্রের রাজ্য অভিষেক হবে।

পূর্ণিমার আগের দিনই রাজপুত্র পালিয়ে গেলেন। মারুতিতে

চড়ে, শ্যেনদেবকে নিয়ে! হাজির হলেন সেই হীরকবন্দরে, ধীব ভাই সেখানে অপেক্ষা করছেন ওর জন্যে। ঠিক সময়ে নৌকো নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন দুজনে। আবার ভেসে উঠলো কদমগাছ। এবারও তাতে দেখা গেল সোনারূপোর কদম্বটি। কী মনে হলো কালভৈরবের নাম করে বৃদ্ধ জেলে আবার জাল ছুঁড়লো, শ্যেনদেবও আবার উড়ে গিয়ে ডাঁটি ভেঙে দিলে, ফুলও এসে পড়লো রাজপুত্রের নৌকোয়। যত্ন করে ফুলটি দু'হাতে নিয়ে রাজপুত্র বললেন—'হে সোনারূপোর কদম্ব, তোমার জন্যেই আমি আমার বাবাকে হারিয়েছি। তুমিই এবার তবে আমাকে পথ দেখাও, বাবার কাছে নিয়ে চল।'—পূর্ণ চাঁদের আলোয় পান্না সমুদ্রের ঢেউ, এলাচিনদীর শাদাজল, লবঙ্গদ্বীপের খয়েরী মাটি, সবই যেন মায়াভরা—লবঙ্গের গন্ধে নেশা ধরে যায়। রাজপুত্র তো ফুল হাতে ডাঙ্গায় লাফিয়ে পড়লেন। ডানহাত তরোয়ালের বাঁটে। সামনেই লবঙ্গবন। নৌকো বেঁধে ধীবর ভাইও এলেন সঙ্গে। বাবা! বাবা! রাজামশাই। রাজামশাই। কত ডাকাডাকি—কোনো সাড়া নেই! বন হঠাৎ ক্রমশ ঘন হয়, আরো ঘন হয়, রাজপুত্র তবু এগোন। হঠাৎ একটি গাছের লবঙ্গলতা যেন একটু বেশি বেশি দুলে উঠলো। সাপ নাকি? রাজপুত্তুর এগিয়ে গেলেন, সর্বসিদ্ধি কবচ তাঁর বক্ষ ঢেকে রইলো সযত্নে, শ্যেনদেব চোখ পাকিয়ে নজর করে দেখে বললো—সাপ তো নেই! লবঙ্গলতা তবু দোলে। বাতাস নেই, তবু দোলে। বাতাস যেন থমকে দাঁড়িয়েছে! রাজপুত্তুর কাছে গিয়ে যেই দাঁড়িয়েছেন মাথার ওপরে লবঙ্গফুল ঝরে পড়লো, যেন আশীর্বাদ, আর পড়লো শিশিরের দুটি ফোঁটা, যেন অশ্রুজল। রাজপুত্র আর একটু কাছে এগোতেই তাঁর হাতের সোনা রূপোর কদমফুলটি লবঙ্গলতার গায়ে লেগে গেল। আর অমনি একটা ম্যাজিক হলো।

ধীবর তাড়াতাড়ি মাটিতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে বললে—'পেন্নাম হই, রাজামশাই—ভালো আছেন তো?' রাজপুত্র চেয়ে ছাখেন চমৎকার এক রাজামশাই তাঁর সামনে। তাঁর চোখে জল হাতে অস্ত্র

নেই। তিনি রাজপুত্তুরকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর কদম ফুলের ছোঁওয়ায় একে একে পাশাপাশি লবঙ্গলতাগুলি কোটাল, মন্ত্রী, সদাগর হয়ে উঠলেন, তাঁরা রাজপুত্তুরকে প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করলেন। তারপর সবাই মিলে ফিরে চললেন ধীবরের নৌকোয় চড়ে। ডাঙায় পৌঁছে ধীবর বললে—একবার এলাচি নদীতে জাল ফেলে একটা রাঘব বোয়াল মাছের পেটে আশ্চর্য দুটি পুতুল পেয়েছিলুম। আমার জেলের ঘরে তা মানায় না, রাজামশাই আপনাকে আর কী ভেট দেব—আপনি সেইটিই নিয়ে যান। দেশের রাজাকে কিছু ভেট না দিলে পাপ হয়।'

রাজা বললেন—'তুমি আমার যে উপকার করেছো, ধীবর, তোমাকে কিছুই দিতে হবে না, বরং তুমি যা চাইবে চিরকাল তোমাকে তাই দিয়ে যাবে আমার ছেলে।'

জেলে তবু শোনেনা। 'না না, রাজামশাই, তাই কি হয়? দাঁড়ান, আমি এক্ষুনি আনছি—'

বলে সে নিজের কুটিরে দৌড়োলো। একটু পরেই ধীবর বেরিয়ে এলো। তার কোলে কাঁদো কাঁদো মুখে বসে আছে একটি ছোট্ট মেয়ে। আহা। কী সুন্দরী, কী সুন্দরী। এলাচি নদীর মতন স্বচ্ছ শাদা তার চামড়ার রং, পান্নাসাগরের মতন সবুজ তার চোখ, আর দারুচিনি দ্বীপের দারুচিনির মতন গাঢ় বাদামী তার চুল, সারা গায়ে তাজা লবঙ্গফুলের গন্ধ। চোখদুটি জলে ভরা। সে মেয়ে বুকে জড়িয়ে আছে দুটি সোনার পুতুল।—'এটি আমার নাতনী। একে আমি এই পান্নাসাগরের ঢেউয়ে কুড়িয়ে পেয়েছিলুম। নাম রেখেছি লবঙ্গলতা। পুতুল দুটো এরই খেলাঘরের সম্পত্তি হয়ে গেছে কিনা ও ছাড়তে চাইছে না। কিন্তু এসব সোনার পুতুল কি আমাদের গরীবের কুঁড়েতে মানায়? লবঙ্গলতা, দিদিভাই তুমি ও দুটি পুতুল রাজামশাইকে দিয়ে দাও। আমি তোমাকে অন্য দুটি পুতুল এনে দেবো।'

মন খারাপ করে, মুখ ভারী করে, জল ছলছল্ চোখে শঙ্খের কাঁকন পরা সোনার মতন হাত দুটিতে পুতুল বাড়িয়ে ধরল লবঙ্গলতা।

কথার অবাধ্য কী করে হবে ?

রাজামশাই বলতে গেলেন, 'আহা, বাছা, থাক থাক।' তখন সে মেয়ে পুতুল বাড়িয়ে ধরলে রাজপুত্রের দিকে। রাজপুত্র কদমফুল ধরা হাতেই ওকে বাধা দিতে গেলেন—থাক থাক। তোমার খেলার পুতুল তোমারই থাক।' এমন সময়ে কদমফুলটি পুতুলের গায়ে ঠেকে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে ম্যাজিক ! সামনে দাঁড়ালেন ভিজে কাপড়ে মহারাণী মা, আর বৌরাণী। এত লোকের সামনে বৌরাণী লজ্জায় জড়োসড়ো কিন্তু মহারাণী রাজামশাইকে—'খোকা রে !' বলে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বৌরাণীও তখন দেখাদেখি রাজপুত্তুরকে—'খোকারে !' বলে জড়িয়ে ধরলেন। এই না দেখে, ধীবরের মেয়ে

আহ্লাদে হাততালি দিয়ে উঠল। তখন মহারাণীমা লবঙ্গলতাকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন—'ধীবর, তোমার ঘরে এতদিন আমাদের যেমন আদরে রেখেছিলে, আমার ঘরেও তোমার এই সোনার পুতুল-টিকে আমি তেমনি আদর যত্নে রাখবো। আমাদের খেলার সাথীটিকে ছেড়ে তো আমরা রাজপ্রাসাদে ফিরে যেতে পারি না! তোমার নাতনীকে আমার নাতির জন্যে চেয়ে নিচ্ছি। তুমি এতে রাজী

তো ?'—ধীবরের তো মুখে কথাই ফুটছে না। সে মহারাণীর পায়ে উপুড় হয়ে বললে—'মা গো, এত সৌভাগ্যিও মানুষের হয় ?'

তারপরে আর কী ?

ধীবরের কুটিরটাকে শ্বেতপাথরের প্রাসাদ করে দিয়েছেন রাজামশাই, আর চন্দনকাঠের জেলে ডিঙি নিয়ে রূপোর সুতোর জাল ফেলে সে মাছ ধরতে বেরোয়।

রাজপুত্তুর মারুতিতে চড়ে রাজপ্রাসাদে গিয়ে রথ, পাল্কী, লোকলস্কর নিয়ে হীরকবন্দরে ফিরে এলেন, রাজরাণী, মহারাণী, লবঙ্গলতা, মন্ত্রী, কোটাল, সদাগর, সবাইকে নিয়ে সুখী প্রজাদের বিরাট মিছিল ফিরে চলল বাজী পোড়াতে, পোড়াতে, গান গাইতে গাইতে। রাজধানীতে পৌঁছে, একই সঙ্গে রাজপুত্রের অভিষেক উৎসব আর বিয়ে হল। ছোট্ট রাজপুত্র রাজা হয়ে গেলেন। আর একগাল হেসে হারামণি ছেলের হাতে আরেকবার মন্ত্রিত্বের ভার তুলে দিয়ে বৃদ্ধমন্ত্রী আবার রিটায়ার করলেন। আর ধাইমা ? লবঙ্গলতা আর রাজপুত্তুরকে কোলে নিয়ে তাঁর ফোক্‌লা মুখে যেন চাঁদের আলো উথ্‌লে উঠলো।

কালভৈরবের মন্দিরে এখন দুটো জ্বলজ্বলে সোনারূপোর কদম্বফুল। সে ফুল কোনোদিন শুকোয়না। শুকোবে কী করে, সে ফুল শুধু রূপকথাতেই ফোটে কিনা ?

বাঁকিপুরের মস্তান

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

হাওড়া বর্ধমান কর্ড লাইনে মীর্জাপুর-বাঁকিপুর নামে একটি স্টেশন আছে। স্টেশনের একদিকের প্ল্যাটফরম মীর্জাপুরে এবং অপর দিকেরটি বাঁকিপুরে।

অনেকদিন আগেকার কথা, বাঁকিপুরের এক মেছুনি মীর্জাপুরের হাটে যেত মাছ বিক্রী করতে। তখন এসব জায়গা ছিল ঘন বন-জঙ্গলে ভরা। মেছুনির নাম নিস্তারিণী। খুব দুর্দান্ত মহিলা এবং অসম সাহসী বলে ব্যাপক পরিচিতি ছিল তার। একা একা রাত ভিত দূর দূরান্তরে যাওয়াটা তার কাছে কোন ব্যাপারই ছিল না। তা হাট থেকে ফিরতে নিস্তারিণীর একটু রাত হয়ে যেত। তখনকার দিনে গ্রামে ঘরে সন্ধ্যে রাতই তো অনেক রাত। সেই রাতে মাথায় মাছের শূন্য ঝুড়ি আর হাতে আঁশ বঁটি নিয়ে গ্রামে ফিরত নিস্তারিণী।

মীর্জাপুর বাঁকিপুর পাশাপাশি গ্রাম হলেও দূরত্ব ছিল অনেক-খানি। আর ওখানে তখন হাট বসত বিকেলের দিকে। তা ফেরার সময় রাতের অন্ধকারে নিস্তারিণী প্রায়ই শুনতে পেত ছায়া ছায়া কালো কালো কারা যেন বলছে—এঁই মাছ দেঁ না।

ওরা যে কারা তা নিস্তারিণী বেশ ভালভাবেই জানত। কিন্তু ভয় ডর বলে তো কিছুই ছিল না ওর, তাই বলত—মাছ খাবার সখ হয়েছে, মাছ খাবি? তা আমার নাম নিস্তারিণী। বাঁকিপুরের ডাক সাইটে মেয়ে আমি। দেখছিস হাতে কি? এই আঁশবঁটি দিয়ে নাক কান কেটে ছেড়ে দেবো। দূর হ!

—দেঁ না রে। রাঁগ করিস কেন! খুঁব খেতে ইচ্ছে করছে।

—খেতে ইচ্ছে করছে তো পুকুরে যা। অনেক মাছ পাবি। আমার টুকরিতে কি মাছ আছে যে দেবো ?

—পুঁকুরে তো জঁাল ফেলা আছে। যদি জঁড়িয়ে যাই ?

—তবে চুলোর দোয়ারে যা। ভাগ্‌!

অবশেষে পালাত সব।

আর নিস্তারিণী গজ গজ করতে করতে বাড়ি ফিরত। মর্‌ মর্‌ হতচ্ছাড়ারা। জ্বালিয়ে খেলে। সারা রাস্তাটা মাছ দে, মাছ দে, যমের বাড়ি যা।'

নিস্তারিণীর মুখে এই সব শুনে সকলে বলত—আর কেন পিসি ? তিন কূলে কেউ তো নেই তোমার। কি দরকার ঐরকম বিপদের ঝুঁকি নিয়ে আসতে যাবার ? একটু বেলা বেলি ফিরলে তো পারো। গ্রামে ঘরে থাকি আমরা। ভূতের উপদ্রবে তো জ্বলে পুড়ে মরছি। জেনে শুনে ওদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রোজ ঐভাবে আসবার দরকারটা কি ? একটু বেলা বেলি এসো এবার থেকে।

নিস্তারিণী বলল—তাই কি হয় রে বাবা। বেলা বেলি ফিরব বললেই কি ফেরা যায় ? সব মাল বেচতে কুচতেই তো সন্ধ্যে কাবার। তারপর দুটি মুড়ি মিষ্টি কিনে একটু জল টলও তো খেতে হবে। কাজেই রাত হয়।

কথাটা সত্যি। যার যা কাজ তাকে তা করতেই হয়। আর ফেরবার সময় এ পথে আসার সঙ্গীও কেউ থাকে না। কাজেই একা একাই ফিরতে হয়।

সেদিনও হাটবার ছিল। নিস্তারিণী রাতের অন্ধকারে একা একা ফিরছিল হাট থেকে। আজ একটা ছোট রুই মাছ বেঁচে গেছে তার। কাজেই মনটাও বিশেষ ভালো ছিল না। আসার পথে বনের ভেতর শুরু হল উপদ্রব—ওঁরে কে আছিস, দেঁখবি আয় পিঁসী আজ আমাদের জন্যে মাছ এনেছে।

নিস্তারিণী রেগে বলল—আয় নিবি আয়। এই আঁশ বঁটি দিয়ে

যদি না তোদের নাক কান কেটে দিই তো কি বলেছি।

কিন্তু বললে কি হবে? কে কার কথা শোনে?

চারদিক থেকে সবাই এসে ছেঁকে ধরল নিস্তারিণীকে। সবাই এক জোট হয়ে বলল—আঁজ আর তোঁকে ছাঁড়ছি না পিসি। রোঁজ ফাঁকি দিয়ে চলে যাস। আঁজ তোকে মাছ দিতেই হবে।

নিস্তারিণী বলল—দিতে তো কোন আপত্তি নেই। তবে তোরা যে ভারি বদ। তোদের হাতে মাছ দিলেই তো তোরা আমাকে মেরে ফেলবি।

—না না মাঁরব না। ভঁয় নেই।

—ঠিক বলছিস?

—হ্যাঁ, ঠিঁক বলছি। মাছ দেঁ।

—তাহলে একটু এগিয়ে গিয়ে ঐ ঐখানটায় দাঁড়া।

বলা মাত্রই অশরীরী ছায়াগুলো এগিয়ে গিয়ে সেইখানে দাঁড়াল। নিস্তারিণীও এক পা দু'পা করে এগিয়ে চলল।

—কঁই দেঁ?

—আর একটু এগিয়ে যা।

ছায়ারা আরো এগিয়ে গেল। এঁবার দেঁ।

—আঃ। এত তাড়া কেন? বলছি তো দেবো। রেল লাইনটা পেরিয়ে ওপারে যা, ঠিক দেবো।

—ঠিঁক দিবি তো ? তুঁই কিন্তু অনেকক্ষণ থেকেই দেঁবো দেঁবো কঁরছিস কিন্তু দিঁচ্ছিস না।

এবার ঠিক দেবো।

ছায়াগুলো এবার লাইন পেরিয়ে বাঁকিপুরের জঙ্গলে গিয়ে ঢুকল। নিস্তারিণীও লাইন পার হয়ে এপারে এলো। এইভাবে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে শুঁড়ি পথ বেয়ে খানিকটা যেতে পারলেই গ্রামে গিয়ে পৌঁছবে। অতএব আর একটু যদি ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় ওদের তাহলে চেঁচামেচি করে লোকজন ডেকে তাড়ানো যাবে এবারের মতো। কিন্তু না। নিস্তারিণী যা ভাবল তা হ'ল না। আর যাওয়া গেল না। ততক্ষণে গাছের কাঁচা ডাল ভেঙে বাঁশ গাছ নুইয়ে পথ বন্ধ হয়ে গেছে।

নিস্তারিণী বলল—একি ! এইভাবে পথ আটকালি কেন ? বনের ভেতরে সাপ খোপ কোথায় কি আছে, তোদের কি কাণ্ডজ্ঞানও নেই ? তার চেয়ে আমার বাড়িতে চল ! ভালো করে মাছ রেঁধে খাওয়াব তোদের।

অমনি উত্তর এলো—আঁমরা রান্না মাছ খাঁই না পিসি। ঐঁ মাছ তুই এখানেই দেঁ। যঁদি না দিস তাঁহলে জেনে রাখিস আজই তোর শেষ রাত।

নিস্তারিণী বুঝল আজ সত্যিই তার নিস্তার নেই। কেননা যেভাবে মরণ ফাঁদে আটকেছে ওরা তাতে এই ঘেরা টোপ থেকে কোন মতেই প্রাণ নিয়ে পালাতে পারবে না সে। আজ ভূতের হাতেই মরতে হবে তাকে। নিস্তারিণী তখন হঠাৎ একটু চেঁচিয়ে বলতে লাগল—চারদিকে এত ভূত কিন্তু আমাদের এই বাঁকিপুরে কি কেউ কোথাও মরে ভূত হয়ে নেই গো। আমি একজন অসহায় স্ত্রীলোক। মীর্জাপুরের ছ্যাঁচোড় ভূতগুলো এসে আমাকে একা পেয়ে বাঁকিপুরের মাটিতে দাঁড়িয়ে ভয় দেখাচ্ছে। আর তোমরা বাবারা এটাকে মেনে নেবে ? তোমরা কি কেউ আমাকে সাহায্য করবে না ? এটা তো

তোমাদেরও মান ইজ্জতের ব্যাপার। তোমরা থাকতে আমি বেঘোরে মরব?

সঙ্গে সঙ্গেই হৈ হৈ করে উঠল কারা—কেঁ! কেঁ ডাকে আমাদের? কেঁ গো।

—আমি বাঁকিপুরের নিস্তারিণী। এই দেখ না বাবারা মির্জা-পুরের ছ্যাঁচড়া ভূতগুলো এসে আমাকে কি রকম জ্বালাতন করছে।

—ওঁ। আঁমাদের নিস্তার পিসী? তোঁমাকে ভয় দেখাচ্ছে মীর্জাপুরের ভূঁতেরা! দাঁড়াও মজা দেখাচ্ছি। বলেই বাঁকিপুরের ভূতেরা অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে মীর্জাপুরের ভূতেদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর সে এক রীতিমতো খণ্ড যুদ্ধ। বাঁকিপুরের ভূতেরা বলল—চাঁলাকি পেয়েছিস তোঁরা? বেঁপাড়ার ভূত এঁপাড়ায় এসেছিস রঙবাজি করতে? আঁমরা কোনদিন ভুলেও পিসীকে ভয় দেখাইনি। আঁর তোদের এত সাহস যে আমাদের পিসীকে তোরা ভয় দেখাস! ভূত ভূতের মতন থাকবি, মানুষের পিছনে লাগা কিরে? আর কোন দিন যদি এই তল্লাটে তোদের দেখেছি তো মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেবো। তোদের চেয়েও সংখ্যায় আমরা অনেক বেশি। আমরা যদি সবাই গিয়ে এবার দলে দলে তোদের মীর্জাপুরে ঢুকি তো এই অঞ্চল ছেড়ে পালাতে পথ পাবি না তোরা। বুঝলি?

বলার সঙ্গে সঙ্গেই তো মীর্জাপুরের ভূতেরা দৌড় দৌড় দৌড়।

বাঁকিপুরের ভূতেরা বলল—তা নিস্তার পিসী, এবার তুমি নিশ্চিন্ত মনে ঘরে যেতে পারো। যা শিক্ষা দিয়েছি ওদের ওরা আর কখনো তোমাকে জ্বালাতন করবে না। এই বলে সবাই মিলে হাতা হাতি করে গাছের ডাল পালা সরিয়ে নোয়ানো বাঁশ খাড়া করে পথ পরিষ্কার করে দিল পিসীর।

নিস্তারিণীও এবার নিশ্চিন্তমনে ঘরে ফিরে এলো!

অদৃশ্য বিভীষিকা

অদ্রীশ বর্ধন

গোয়েন্দারা অদ্ভুতকর্মা হয়। বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ করে অনেক জটিল রহস্যের সমাধান করে ফেলে। কিন্তু বুদ্ধি দিয়েও বিশ্লেষণ করা যায় না, এমন অনেক রহস্য এই পৃথিবীতে আছে। আমার গোয়েন্দা বন্ধু ইন্দ্রনাথ রুদ্র এমনি এক ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে যে কি বিষম নাকানিচোবানি খেয়েছিল, এ কাহিনী সেই কাহিনী। অদৃশ্য বিভীষিকার কাহিনী।

না, না, ভূতের গল্প এটা মোটেই নয়। সাধারণ মানুষের কাছে অবশ্য ভৌতিক ব্যাপার বলেই মনে হয়েছিল গোড়া থেকে। গোটা তল্লাটের প্রতিটি মানুষের গায়ে কাঁটা দিত অশরীরীদের শরীরী ভয়াবহতার কাণ্ডকারখানা শুনে। ইন্দ্রনাথ, শুধু ইন্দ্রনাথই, লোমহর্ষক ব্যাপারগুলির মূলে যে অদ্ভুত রহস্যটি রয়েছে, তার হদিশ বার করতে পেরেছিল।

তার বেশি আর এগোতে পারেনি। বিশ্বের কেউই পারেনি। এ রহস্য বাঘা বাঘা বৈজ্ঞানিকদের কাছে আজও এক মস্ত প্রহেলিকা হয়ে রয়েছে।

ঘটনাগুলো ঘটেছিল অন্ধ্রপ্রদেশের নেল্লুর-গুণ্টুর অঞ্চলের বালুকাময় সমুদ্রোপকূলে। খর্বগ্রীব ও স্ফীতোদর এই রাজ্যটি দাক্ষিণাত্য উপত্যকার প্রায় এক চতুর্থাংশ জায়গা জুড়ে রয়েছে। সমুদ্রোপকূলের দৈর্ঘ্যই প্রায় ৬০০ মাইল। প্রাকৃতিক দৃশ্য সর্বত্রই মনোরম। বনজঙ্গল পাহাড় দেখে দেখে শরীর আর মন দুটোকেই চাঙা করে নিয়ে বন্ধুবর ইন্দ্রনাথকে নিয়ে আমি এসেছিলাম গুণ্টুরে। দেখতে

গেছিলাম গুন্টুর থেকে ১৮ মাইল দূরে অমরাবতী। সাতবাহনের অধীনে অন্ধ্রদের প্রাচীন রাজধানী আর দক্ষিণ ভারতে মহাযান বৌদ্ধদের প্রধান কেন্দ্র ধান্যকেটকর ধ্বংসাবশেষ দেখেছিলাম। দু'হাজার বছর আগেকার বিশ্ববিখ্যাত মহাচৈত্যের সামনে অর্ধ-যাযাবর বন্‌জারা মেয়েদের নাচ দেখতে দেখতে সন্ধ্যে ঘনিয়ে এসেছিল।

ফেরার পথে বিপদে পড়লাম। যে ট্যাক্সিটিতে এসেছিলাম, তার ইঞ্জিন বিগড়েছে। প্রমাদ গণলাম। আঠেরো মাইল পথ ঠেঙিয়ে এখন যাই কি করে?

বিদেশে বাঙালীবেশ পরার সুফলটা পেলাম হাতে হাতে। সিনথেটিক জামা-কাপড়ে ইণ্ডিয়া এখন ছেয়ে গেলেও ইন্দ্রনাথ আর আমি দুজনেই ধুতি-পাঞ্জাবীর বিষম ভক্ত। এই একটি ব্যাপারে আমরা দুজনেই আদি এবং অকৃত্রিম বাঙালী।

মুখ চুন করে গাছতলায় দাঁড়িয়ে জল্পনাকল্পনা করছি কি করা যায়, এমন সময় কোত্থেকে হু-উ-উ-স্ করে একটা জীপ এসে ক্যাঁচ করে ব্রেক কষল সামনে। ড্রাইভারের সিটে বসে থাকা ধুতি পাঞ্জাবী পরা এক প্রৌঢ় পরিষ্কার বাংলায় বললেন, ঝামেলায় পড়েছেন মনে হচ্ছে?

ভদ্রলোক রীতিমত সুদর্শন। পুরুষালি চেহারা। মিলিটারী ড্রেস পরিয়ে দিলে মিলিটারী অফিসার বলেই মনে হবে। পাকান ছুঁচোল গোঁফ। কদমছাঁট কাঁচা পাকা চুল। চওড়া কাঁধ আর চ্যাটালো বুক দেখেই বোঝা যায় রীতিমত শক্তির অধিকারী।

হাঁ করে তাকিয়ে আছি দেখে অট্ট হেসে মহাচৈতন্যের নড়বড়ে ইঁট কাঁপিয়ে ভদ্রলোক বললেন, বন্‌জারাদের নাচ তো দেখলেন। বন্‌জারা মানে জানেন? জিপসী···জিপসী···আপনারাও দেখছি বন্‌জারা বাঙালী। উঠে পড়ুন উঠে পড়ুন, যেতে যেতেই আলাপ করে নেওয়া যাবে।

আঠেরো মাইল পথ শেষ হওয়ার আগেই জমাটি আলাপ জমে গেল ভদ্রলোকের সঙ্গে। নাম তাঁর নগেন লাহা। বাপ-পিতামহের

টাকায় ছাতা পড়ছে। ভারতের নানা জায়গায় জায়গাজমি কিনে প্রাসাদোপম বাড়ি বানিয়ে বংশধরদের স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করে গেছিলেন তাঁরাই। গুন্টুরের সমুদ্রোপকূলেও এমনি একটি নিরালা নিকুঞ্জ আছে। নগেন লাহা সেখানেই আছেন বছর চারেক। একেবারে একা। বিয়ে-থা করেননি। আত্মীয়স্বজন কাউকে এনেও রাখেননি। কেউ আসার জন্যে চিঠি দিলেই অমনি পাল্টা চিঠি দিয়ে জায়গাটার ভয়াবহতা জানিয়ে ইংরেজীতে ছোট্ট একটি ছড়া লিখে দেন ঃ

No friend
No foe,
No lands
to go.
No man
to vie
Stay here
to die.

নগেন লাহা যে ভয়ানক রসের রসিক এবং ছড়াভক্ত, তা বুঝলাম। কিন্তু বুঝলাম না, কেন তিনি সবাইকে জায়গাটার ভয়াবহ চিত্র উপহার দিয়ে, আসা বন্ধ করেন। বলাবাহুল্য বনজারা এই বাঙালী ছুটোকেও ছড়াছুটো শুনিয়ে দিলেন নিশ্চয় সেই একই উদ্দেশ্যে।

তাই পরিচয় দিতে হল ইন্দ্রনাথের।

উনি শুনেই ভুরু-টুরু কুঁচকে বললেন, রহস্যভেদী ?

সবিনয়ে আমি বললাম, আজ্ঞে হ্যাঁ। যেখানে বিপদ, যেখানে রহস্য, যেখানে ভয়ঙ্করের নৃত্য—ইন্দ্রনাথ সেখানে থাকবেই। না ডাকলেও যাবে।

অর্থাৎ আপনাদের পান সুপুরি দিয়ে নেমন্তন্ন না করলেও হানা দেবেন আমার আস্তানায় ?

মৃদু হেসে ইন্দ্রনাথ বললে, নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন সে বিষয়ে।

নগেন লাহা কপাল কুঁচকে কি যেন ভাবলেন।

তারপরে বললেন, উঠেছেন কোন চুলোয় ?

গুন্টুরের এক পান্থশালায়।

চলুন, বাক্স প্যাঁটরা নিয়ে যাওয়া যাক সেখান থেকে। দেখা যাক আপনি কত বড় রহস্যসন্ধানী।

কিন্তু রহস্যটা কি ?

সেটা জানলে তো ল্যাটা চুকেই যেত। কিন্তু যা ঘটছে, তা স্রেফ ভৌতিক, অলৌকিক, অপচ্ছায়াদের কাণ্ড বলেই মনে হচ্ছে। আমার হাতের গুলিখানা দেখেছেন—বলে বাইসেপ্স ফুলিয়ে (তার আগে পাঞ্জাবীর আস্তিন গুটিয়ে নিয়ে) হাতে একটা লোহার বলের মতো নিরেট পেশীপিণ্ড দেখালেন—টক্কর দেওয়ার মত মানুষ থাকলে কোন্‌কালে খুলি উড়িয়ে দিতাম রাইফেলের গুলি দিয়ে। কিন্তু যাদের দেখাই যায় না, রক্ত মাংসের প্রাণীদের অদৃশ্য বানিয়ে দিয়ে পাগল করে ফেরত দিয়ে যায়—তাদের সঙ্গে কি করে টক্কর দিই বলুন তো। ছড়া বানিয়ে রেখেছি সেই কারণেই। শোনবার পরেও মরার পালক উঠেছে যখন. তখন চলে আসুন।

বড় ভয়ঙ্কর, বড় রহস্যময় উৎপাত চলছে নগেন লাহার আস্তানায় বছর খানেক ধরে। গুন্টুরের সমুদ্রোপকূলের ধারে বিশাল এই স্বাস্থ্যনিবাসটা শূন্য পড়েছিল দীর্ঘদিন ধরে। উনি কলকাতার ব্যাঙ্কের টাকায় ছাতা গজাতে দিয়ে এখানে চলে এলেন দু-মাসের বাচ্চা একটা বাঘকে নিয়ে। বাঘকে মানুষের সঙ্গে রাখলে মানুষের বন্ধু করে তোলা যায় কিনা—এই এক্সপেরিমেন্ট করবেন বলেই সুন্দরবনে শিকার করতে গিয়ে পাকড়াও করেছিলেন ব্যাঘ্র-শিশুকে। তার নাম দিলেন বাঘা। একটা হায়নার বাচ্চাকেও সঙ্গে আনলেন—তার নাম দিলেন ডায়না। সেই সঙ্গে রইল একটা ভালুকের বাচ্চা। নাম দিলেন তালুক। গোড়া থেকেই বন্য পরিবেশ থেকে সরিয়ে রাখার ফলে বাঘা তাঁর বিছানাতেই শুত। ডায়না আর তালুকের

সঙ্গে খেলা করত। দু মাসের বাঘা কেঁদো বাঘ হয়ে উঠেছিল তিন বছরেই! তারপরেই শুরু হল অদ্ভুত অলৌকিক কাণ্ড কারখানা।

চোখের সামনে থেকেই একদিন ফুস্ করে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল ডায়না—মানে হায়নাটা। হতভম্ব হয়ে থুত্‌নি চুলকোতে চুলকোতে নগেন লাহা ভাবছেন—এ আবার কি ব্যাপার! অমনি ঠিক তাঁর পাশেই দেখা গেল ডায়না দাঁড়িয়ে আছে।

পরক্ষণেই দাঁত বার করে তেড়ে এল তাঁকে কামড়াতে। নগেন লাহার মধ্যে ইদানীং পশু-প্রেম জাগ্রত হলেও আসলে তো তিনি

পাকা শিকারী। পোষা কুকুর পাগলা হয়ে গেলে তাকে গুলি করতে দ্বিধা করেন না। সুতরাং অদৃশ্য লোক থেকে ফিরে এসে ডায়নার মাথা যে বিগড়েছে, এটা বুঝে নিয়েই তৎক্ষণাৎ এক গুলিতে উড়িয়ে দিলেন তার খুলি।

এর ক'দিন পরেই একই ঘটনা ঘটল বাঘা আর তালুকের ক্ষেত্রেও। দুজনেই বলা নেই কওয়া নেই দিন দুপুরে বেমালুম বাতাসে মিশে গিয়ে কিছুক্ষণ পরেই আবির্ভূত হল অদৃশ্য হওয়ার জায়গা থেকে কিছুটা দূরে—একেবারে বন্য অবস্থায়। দুবারই স্রেফ প্রাণ বাঁচানোর জন্যে গুলিবর্ষণ করে দুই মূর্তিমানকেই পরলোকে প্রেরণ করলেন নগেন লাহা।

খবরটা কিন্তু তখনও পাঁচকান হয়নি। হল যখন স্থানীয় কয়েকটি লোক ঠিক একই ভাবে তরিতরকারি দিতে এসে এক জায়গায় অদৃশ্য হয়ে গিয়ে আবির্ভূত হল আরেক জায়গায়—বদ্ধ উন্মাদ হয়ে।

সেই থেকে তল্লাট জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে আতঙ্ক। কেউ আর তাঁর স্বাস্থ্যনিবাস মাড়ায় না। খাবারদাবারের সন্ধানে তাঁকে অথবা তাঁর গৃহভৃত্যকেই যেতে হয় হাটে বাজারে। কিন্তু দুজনেরই ধারে কাছে কেউ ঘেঁষতে চায় না।

কারণ অতি স্বাভাবিক। নিশ্চয় ভূতেদের পাণ্ডা এই দুজনে। নইলে তাঁদের গায়ে আঁচড়টি লাগছে না কেন?

সব বলে অট্টহেসে নগেন লাহা বললেন, কি মশায়, এরপরেও যাবেন?

একটিপ নস্যি নিয়ে ইন্দ্রনাথ বললে, অবশ্যই।

আমার উৎসাহ কিন্তু উবে গেছিল। বুক ঢিপ ঢিপ করছিল।

জায়গাটা খাসা। এক্কেবারে সমুদ্রের ধার ঘেঁষে কয়েক বিঘে জমি উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। স্বাস্থ্যনিবাসটাই প্রায় আধ বিঘে জমির ওপর তৈরি। বিশাল তিন তলা প্রাসাদ। কত টাকা থাকলে এমন পাণ্ডববর্জিত জায়গায় এতবড় বাড়ি বানিয়ে ফেলে রাখা যায়,

ভাবতেই মাথা ঘুরে গেল।

জীপ থেকে নামবার আগেই জিজ্ঞেস করেছিল ইন্দ্রনাথ, সাবধানের মার নেই। তাই একটা কথা আগেই জিজ্ঞেস করি। এতগুলো মানুষ আর প্রাণী অদৃশ্য হয়ে গেছিল কোন সময়ে? দিনের আলোয়, না, রাতের অন্ধকারে?

নগেনবাবু বললেন, সেইটাই একটা জবর প্রহেলিকা। ভূত-প্রেতরা শুনেছি রাতের অন্ধকারেই খেল দেখায়। আমার ভূতপেত্নীরা মানুষ আর জন্তু উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ফেরত দিয়ে যায় দিনের বেলায়।

বহুত আচ্ছা—বলে গাড়ি থেকে নামল ইন্দ্রনাথ, তাহলে রাতের অন্ধকারে নির্ভয়ে এক চক্কর দেওয়া যেতে পারে।

অমাবস্যার অন্ধকারে খোদ ভূতের মতই বিকট হেসে উঠলেন নগেনবাবু, ভয় পেয়েছেন মনে হচ্ছে?

আড়মোড়া ভেঙে ইন্দ্রনাথ অন্য কথায় চলে গেল, অদৃশ্যকরণ এবং পুনরাবির্ভাবগুলো ঘটেছিল কোন কোন জায়গায়?

টর্চ জ্বালিয়ে প্রাসাদের সামনে খোলা মাঠটা দেখিয়ে বললেন নগেনবাবু, এই মাঠে—আর কোথাও নয়।

মাঠটাই তাহলে অভিশপ্ত?—ইন্দ্রনাথের প্রশ্ন।

তা যা বলেছেন। অভিশাপ অবশ্য পুরো বাড়িটার ওপরেই আছে। সেই ভয়েই তো এত বছরের মধ্যে কেউ এখানে থাকতে আসেনি।

অভিশাপ? কিসের?

আমাদের এক পূর্বপুরুষের হাঁপের ব্যায়রাম ছিল। সমুদ্রের ধারেই শেষ জীবন কাটাতে এসেছিলেন। মৃত্যুর সময়ে দুই ছেলেকে কলকাতা থেকে ডাকিয়ে এনে বললেন—'ডাক্তার ডাক।' তারা বললে, 'আগে বল পেটি বোঝাই হীরে জহরৎ সোনার বাটগুলো কোথায় রেখেছ—ডাক্তার ডাকব তারপর।' গোঁয়ার ছিলেন আমার সেই প্রপিতামহ। গুপ্তধনের সন্ধান তো দিলেনই না—মারা যাওয়ার আগে বলে গেলেন, যখ হয়ে সব আগলাবেন। কাউকে এ বাড়িতে

টঁ কতে দেবেন না। দুই ভাই বাপকে পুড়িয়ে-টুড়িয়ে এসে বেশ কিছুদিন ধরে খুঁজল গুপ্তধন। পেল না। তারপরেই এক ভাই যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। আর এক ভাই ফিরে গেল কলকাতায়। সেই যখের ভয়ে কেউ আসেনি।

কিন্তু আপনি আসার তিন বছরের মধ্যে কিচ্ছু ঘটেনি?

একেবারে না। এখনও আমার গায়ে আঁচড়টি লাগেনি।

কেন বলুন তো?

দেখুন মশাই, একটা কারণ হতে পারে, গুপ্তধনের সন্ধান আমি কখনো করিনি। কিন্তু সে কারণটা বলতে গেলে মানতে হয় আমি ভূতপ্রেতে বিশ্বাস করি। মোটেই তা করি না। আসলে আমি যুক্তিবাদী এবং সাবধানী। প্রথমেই আপনি যে প্রশ্নটা করেছিলেন, নিজেকেই সে প্রশ্ন করেছি অনেক আগেই। বুঝতেই পারছেন কি বলতে চাইছি। যত কিছু কাণ্ড ঘটছে ঐ মাঠেই। তরিতরকারী নিয়ে যারা বাড়িতে ঢুকেছিল, ঐ মাঠ পেরোতে গিয়েই তারা অদৃশ্য হয়ে গেছে—আবার মাঠের মধ্যেই ফিরে এসেছে। সুতরাং ঐ মাঠকে আমি এড়িয়ে চলি।

রাতের অন্ধকারে থমথমে মাঠটার দিকে তাকিয়ে গা শিরশির করে উঠল আমার।

লম্বা মত একটা ছায়ামূর্তি বেরিয়ে এল প্রাসাদ থেকে। হাতে লণ্ঠন। জীপ থেকে মালপত্র নামিয়ে নিয়ে গেল ভেতরে।

নগেনবাবু বললেন, আমার চণ্ডীপাঠ থেকে জুতো সেলাই করার ভার এর ওপর। এতদিন খালি বাড়ি পাহারা দিয়েছে—এখন দিচ্ছে আমাকে। শিবাজীর মত বিশ্বাসী লোক এ যুগে বিরল।

মারাঠি?

নামটা শুনেই ধরেছেন ঠিক। ও কিন্তু খাঁটি তেলেগু আর খাঁটি বাঙালী বনে গেছে। দেশে কেউ নেই!

সকালবেলা শিবাজীকে দেখে তাজ্জব হয়ে গেলাম। কে বলবে

ষাট বছরের বুড়ো। নগেনবাবুর মতই ইয়া বড় গোঁফ—কিন্তু ধবধবে সাদা। মাথার চুল ঘাড় পর্যন্ত লুটোন। তাও ধবধবে সাদা। কপালে অজস্র বলিরেখা। মুখের চামড়া কুঁচকে ঝুলছে। একসময়ে চেহারা খুব ভারী ছিল। এখন চর্বি না থাকায় চামড়া ঢিলে হয়ে গেছে। কিন্তু মেরুদণ্ড এক্কেবারে সিধে। হাঁটাচলা জোয়ানের মত চটপটে। চোখের চাহনিতেও যেন দৃপ্তযৌবন ঠিকরে পড়ছে। বাইরেটা বুড়োটে—কিন্তু ভেতরটা তাজা। এরকম মানুষ জীবনে দেখিনি। মুখে মিষ্টি হাসি লেগেই আছে। কিন্তু কথা বলে খুব কম।

আমাদের পেট ভরে ব্রেকফাস্ট খাইয়ে সে দুপুরের রান্নার জোগাড়ে চলে যেতেই উঠে পড়ল ইন্দ্রনাথ। বললে, চলুন, একটু ঘুরে ফিরে দেখা যাক।

মাঠে ঢুকবেন নাকি ?—বললেন নগেনবাবু দুই চোখে দুষ্টুমি নাচিয়ে।

পাগল। সমুদ্রের ধারে একটু হাওয়া খেয়ে আসি।

চলুন।

বাড়ি থেকে পঞ্চাশ গজের মধ্যেই সমুদ্র। কিছুটা গিয়েই থমকে দাঁড়াল ইন্দ্রনাথ। আঙুল তুলে বললে, ওটা আবার কী ?

দেখলাম দানবিক ধূসর আকৃতির কিছু একটা আস্তে আস্তে উঠে আসছে জল থেকে।

কচ্ছপ—বললেন নগেনবাবু, ডিম পাড়তে আসছে।

এত বড় কচ্ছপ ?—অবাক হয়ে বলেছিলাম আমি।

পঞ্চাশ কেজি মাংস আছে গায়ে। ডিম পাড়বে শ-দেড়েক। দেখুন না, জল যদ্দূর আসছে, ঠিক তার ওপরে এসে গর্ত খুঁড়বে এখুনি।

কিন্তু বেশি দূর আসতে হল না অতিকায় সামুদ্রিক কচ্ছপকে। হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল বালির ওপর থেকেই !

ঘেমে গেলাম আমি। ইন্দ্রনাথ চোখ কুঁচকে চেয়েই রইল।

ভাবখানা যেন কবিতার লাইন ভাবছে, শুধু চোয়াল কঠিন হয়ে উঠতে দেখলাম নগেনবাবুর।

বললেন, আস্তে আস্তে এদিকেও শুরু হয়ে গেল।

আচম্বিতে জলের একদম কিনারায় দেখা গেল কচ্ছপটাকে। হঠাৎ। একটু আগেও কিন্তু সেখানে বালি ছাড়া কিছু ছিল না। ধড়ফড় করে নেমে গেল জলে।

কপালের ঘাম মুছে বললাম, ইন্দ্র আর বেড়িয়ে কাজ নেই।

নস্যির ডিবে বার করতে করতে ইন্দ্রনাথ বললে, পাগল!

দুপুরবেলা খেয়েদেয়ে বাড়ির সামনে বারান্দায় বসে সাত-পাঁচ কথা বলছি, এমন সময়ে শিবাজী এসে আলবোলায় তামাক সেজে রাখল নগেনবাবুর পাশে।

নলচেটা হাতে নিয়ে নগেনবাবু বললেন, এই বিলাসিতাটুকু এখনও ছাড়তে পারিনি। চলবে নাকি?

নস্যির ডিবে বার করে ইন্দ্রনাথ বললে, আমার ব্রেন এতেই বেশি সাফ হয়।—শিবাজী।

শিবাজী চলে যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়াল, কিছু বলছেন?

ভূতে তোমাকে উড়িয়ে নিয়ে যায় না কেন?

কিছু না বলে দাঁত বের করে হাসল শিবাজী। রীতিমত ঝকঝকে সাদা দাঁত।

নগেনবাবু বললেন, আমার জন্যে। মাঠে যেতে দিই না বলে।

এখন থেকে সমুদ্রের ধারেও যাবেন না।—আচ্ছা শিবাজী, ভুতুড়ে ব্যাপার ছাড়া এমন কিছু তোমার চোখে পড়েছে যা অদ্ভুত?

ঘাড় নাড়ল শিবাজী।

এবারেও জবাব দিলেন নগেনবাবু, আমার চোখে পড়েছে। আমার জমির মধ্যে তো বটেই, জমির আশেপাশেও প্রায় সাপের মাথা দেখতে পাই।

সাপের মাথা?

পাশেই দেহটা পড়ে থাকে। ছাল ছাড়ানো। পেট কাটা।

এরকমভাবে সাপ মারে কে, আজও তা জানতে পারিনি। শিবাজীও জানে না।

পেট কাটা? নাড়িভুঁড়ি বার করা?

হ্যাঁ।

কি সাপ?

সবই বিষধর সাপ। যেমন, কেউটে—

কতদিন ধরে দেখছেন?

যদ্দিন এখানে আছি।

শিবাজী চলে গেল রান্না ঘরে।

নগেনবাবু বললেন, বন্‌জারা জিপসীদের কাছে গেছিলাম এই কারণেই।

সপ্রশ্ন চোখে চাইল ইন্দ্রনাথ। নগেনবাবু বললেন, কে জানে কেউ তুকতাক করে যাচ্ছে কিনা। শিবাজীর কথা তাই ঠেলতে না পেরে—আমার বিশ্বাস একেবারেই নেই। শিবাজী বললে জিপসীরা অনেক তন্ত্রমন্ত্র জানে। ওরা হয়ত—

হঠাৎ বললে ইন্দ্রনাথ, দূরের ঐ টিলাটার ওপর ঐ ভাঙা বাড়িটা কিসের?

ওয়াচ টাওয়ার। লাইট হাউসও বলতে পারেন। জঙ্গলের মধ্যে গাছপালা ঢাকা দূরের মিনারটার দিকে তাকিয়ে বললেন নগেনবাবু, এখন সাপখোপের আড্ডা। এক হিপি এসে আস্তানা নিয়েছে বছরখানেক।

নস্যি নিল ইন্দ্রনাথ। বললে, কাটা সাপ পড়ে-টড়ে আছে কোথাও? দেখাতে পারেন?

আসুন। বলে নগেনবাবু নিয়ে গেলেন ঝাউ জঙ্গলে—ঐ দেখুন।

হেঁট হয়ে কেউটের কাটা মুণ্ড দেখল ইন্দ্রনাথ। তারপর একটা কাঠি দিয়ে দেহটা থেকে টেনে বার করা নাড়িভুঁড়ি নেড়েচেড়ে বললে, নেই।

কি নেই!—নগেনবাবুর প্রশ্ন।—পিত্তির থলিটা।

রাত্রে এক ঘরেই শুতাম দুই বন্ধু। মাঝরাতে আমার বাথরুমে যাওয়ার অভ্যেস। সেদিন রাতে মশারি থেকে বেরিয়ে টর্চের আলোয় দেখলাম ইন্দ্রনাথ মশারির মধ্যে নেই।

বাথরুমে যাওয়া মাথায় উঠে গেল। ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগলাম। কোনমতে ফের মশারির মধ্যে ঢুকে সটান বসে রইলাম। ইন্দ্রনাথ যে অদৃশ্য হয়ে গেছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ ছিল না। এবার আমার পালা।

কি আতঙ্কের মধ্যে দিয়ে যে সারা রাত কাটিয়েছি, তা আমি জানি আর ঈশ্বর জানেন। ভোরের আলো যখন ফুটেছে, পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকল বন্ধুবর।

আমার অস্ফুট আর্ত চিৎকার শুনেই ছুটে এল কাছে। মুখ-চোখের অবস্থা দেখেই আঁচ করে নিল ব্যাপারটা।

হেসে বললে, ভয় নেই, অদৃশ্য হয়ে আবার ফিরে আসিনি। পাগলও হয়ে যাইনি। ভৌতিক কাণ্ডকারখানার অবসান ঘটিয়ে এলাম।—না, না, এখন আর কথা নয়। আমি ক্লান্ত, তুমি ভয়ে আধমরা। এস একটু ঘুমিয়ে নিই।

উঠলাম আটটা নাগাদ। খাবার ঘরে গিয়ে দেখি শুকনো মুখে বসে আছেন নগেনবাবু।

আমাদের দেখেই বললেন, সর্বনাশ হল!

কি ব্যাপার?—চমকে উঠল ইন্দ্রনাথ।

শিবাজী অদৃশ্য হয়ে গেছে!

বলেন কী!

রাতারাতি ভ্যানিশড্? ফিরেও তো আর এল না! উৎপাতটা দেখছি এবার বাড়ির ভেতরেও ঢুকে পড়ল।

তাই তো বটে—ভাবিতমুখে দাঁড়িয়ে রইল ইন্দ্রনাথ—এখন খাবার ব্যবস্থা কি হবে?

নগেনবাবু স্পষ্টতই বিরক্ত হলেন, সে ব্যবস্থা আমিই করেছি। আসুন।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আগে খেয়ে নেওয়া যাক—বলে নির্লজ্জের মতো খেতে শুরু করে দিলে ইন্দ্রনাথ। শিবাজী-প্রসঙ্গ নিয়ে কোন কথাই বললে না। আমি ওর রাতের অভিযান সম্পর্কে পাছে মুখ খুলে ফেলি, তাই চিমটি কেটে নিষেধ করে দিলে আমাকেও।

খেয়েদেয়ে ইন্দ্রনাথ বললে, চলুন, মাঠে গিয়ে হাওয়া খাওয়া যাক।

মাঠে!

শিবাজীকে তো একেবারেই উড়িয়ে নিয়ে গেল। আমাদের কাউকে নিয়ে গিয়ে বদলি হিসেবে যদি ফিরিয়ে দিয়ে যায় ওকে—আপনার জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠের আর কোন অসুবিধে হবে না। বন্-জারাদের দিয়ে যা মন্ত্র ঝেড়েছেন—নিশ্চয় কাজ শুরু হয়ে গেছে।

এই প্রথম নগেনবাবুকে রাগতে দেখলাম। একে তো ঐরকম পুরুষালি চেহারা, রেগে যাওয়ার ফলে চোখমুখ দেখে লোম খাড়া হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল আমার।

কড়া গলায় বললেন, মস্করার সময় এটা নয় ইন্দ্রনাথবাবু।

আকাশ থেকে পড়ল ইন্দ্রনাথ, মস্করা তো করছি না। শিবাজীর হাতের রান্না তো কাল খেলাম—খাসা! প্রাণ যায় যাক, এরকম রাঁধুনিকে হাতছাড়া করতে রাজি নই। কোত্থেকে এমন রান্না শিখেছিল বলুন তো? ইন্দোনেশিয়ায়?

এবার আকাশ থেকে পড়ার পালা নগেনবাবুর—আ-আপনি জানলেন কি করে?

জাকার্তায় ছিল নিশ্চয়। খানা খেয়েই বুঝেছি।

সন্দিগ্ধ চোখে চেয়ে রইলেন নগেনবাবু। ইন্দ্রনাথ রুদ্র সম্বন্ধে হাল্কা ধারণাটা যে মন থেকে একটু একটু করে উবে যাচ্ছে, তা মুখচ্ছবি দেখেই আন্দাজ করতে পারলাম।

বললেন থেমে থেমে, খানা খেয়েই বুঝতে পারলেন? অর্থাৎ, কথাটা বিশ্বাস হয়নি।

চেহারাটা দেখেই খটকা লেগেছিল। তারপর যখন বললেন, এখানে এসে পর্যন্ত সাপের কাটা মাথা আর নাড়িভুঁড়ি বার করা দেহ দেখতে

পাচ্ছেন বিস্তর—তখন আর সন্দেহই রইল না।

মা-মানে ?

আচ্ছা, নগেনবাবু, এই বাড়ি যে লোকটা বছরের পর বছর আগলে রেখে দিয়েছে, অদ্ভুত এই ব্যাপারটা তার চোখে পড়া সত্ত্বেও খোঁজ করেনি—করলেও অদ্ভুতকর্মা লোকটি আসলে কে, জানতে পারেনি—আপনি কি তা বিশ্বাস করেন ?

নগেনবাবু জবাব দিলেন না। মানে, দিতে পারলেন না।

ইন্দ্রনাথ বললে, এ থেকেই কি সন্দেহ হয় না, সে জেনেও বলছে না ? চেপে রেখে লাভ ?

কারণ, নামটা শুনে ফেললে শিবাজীর হাতে আর খেতে চাইতেন না বলে। খেতে বসলেই আপনার গা-পাক দিয়ে উঠত। হয়ত তাকে তাড়িয়েও দিতেন বাড়ি থেকে।

ইন্দ্রনাথবাবু, সে কে ?

শিবাজী নিজে।

কি বলছেন ?

জাকার্তায় একরকম সুধা পাওয়া যায়। ওদেশের মুদ্রায় এক কাপের দাম দশ হাজার রুপাইয়া, অর্থাৎ দশ ডলার। এক কোপে কাটা হয় কেউটের মাথা। রক্ত ঢেলে নেওয়া হয় কাপে। তারপর পেট কেটে পিত্তির থলি বার করে নিংড়ে মিশিয়ে দেওয়া হয় সেই রক্তে। খেতে তেতো—তাই একটু মদ মিশিয়ে খাওয়া হয়। এই সুধা নিয়মিত পান করলে জরা কাছে ঘেঁষতে পারে না, শরীর মজবুত থাকে, যৌবন দীর্ঘদিন টিঁকে থাকে। শিবাজীর চেহারায় তার প্রমাণ নেই কী ?

শিবাজী !

আজ্ঞে হ্যাঁ, শিবাজী। জাকার্তা থেকে এই বিদ্যেটি সে শিখে এসেছিল। নিজের হাতে তৈরি করে নিয়মিত খেয়ে গেছে—আপনাকে জানায়নি পাছে আপনার বমি পায়।—চলুন, মাঠে হাওয়া খেয়ে আসি।

ঢোঁক গিললেন দুর্দান্ত শিকারী নগেনবাবু, কিন্তু—

দূর মশায়, সুধা খেয়ে খেয়ে অমর হয়ে এখন অদৃশ্যলোকে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে শিবাজী। সে না ফেরা পর্যন্ত আমাদের কারো ডাক পড়বে না। চলুন, চলুন।

একরকম টানতে টানতেই নগেনবাবুকে নিয়ে অভিশপ্ত মাঠে ঢুকে পড়ল ইন্দ্রনাথ। সত্যি কথা বলতে কি, সেই মুহূর্তে আমার বন্ধুপ্রীতি একটু কমে গেছিল। সঙ্গে সঙ্গে যাইনি। একটু তফাৎ থেকে, মানে, মাঠে না নেমে, দূর থেকে দেখলাম কেউ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে কিনা।

কিন্তু কেউই যখন অদৃশ্য হল না এবং পেছন ফিরে ইন্দ্রনাথ টিটকিরি দিয়ে আমাকে ডাকতে লাগল, তখন বুক দুরদুর করলেও পায়ে পায়ে ঢুকলাম মাঠের মধ্যে।

এবং, অদৃশ্য হলাম না। ইন্দ্রনাথ আমাকে দেখতে পাচ্ছে এবং মিটিমিটি হাসছে দেখেই বুঝলাম অদৃশ্য হইনি।

নগেনবাবুর ভ্যাবাচ্যাকা মুখ দেখে এবং আমার নিজের মুখের অবস্থাও যে ঐরকমই, তা আন্দাজ করে নিয়ে পেটের কথা আর পেটে চেপে রাখতে পারলাম না। তেড়েমেড়ে বলে ফেললাম, কোথায় গেছিলে কাল রাতে বল তো?

নিরীহ মুখে ইন্দ্রনাথ বলে, এ-এইটা খুঁজতে—বলতে বলতে পাঞ্জাবী তুলে ধুতির ফাঁকে কোমরে গোঁজা একটা গুলতির মত বস্তু বার করল।

এটা আবার কী?—বিমূঢ় স্বর নগেনবাবুর।

গুপ্তধন সন্ধানের যাদুকাঠি।

মানে?

হেসে উড়িয়ে দেবেন না। আধুনিক আমেরিকার বহু সিটি কর্পোরেশনে আর প্রাইভেট কারখানায় এই বস্তুটি দিয়ে মাটির তলায় কি আছে, তা সন্ধান করা হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে ক্রিমিন্যাল খুঁজে বার করা হত এই যাদুকাঠি দিয়ে। আমি জেনেছি অপরাধ-বিশেষজ্ঞ হিসেবেই।

যাদুকাঠি!

ইংরেজিতে বলা হয় ডাউজারের ডিভাইনিং রড। আগেই তৈরি হত হ্যাজেল কাঠ দিয়ে, আজকাল ধাতু দিয়েও হয়। এর গুণ অনেক। শরীরের কোথায় ব্যাধি লুকিয়ে আছে, তা বার করা যায়। কে কোথায় জলে ডুবে আটকে রয়েছে, তাও বলে দেওয়া যায়। মাটির তলায় লুকোন গুপ্তধনের সন্ধানও করা যায়। এই যাত্নকাঠির ব্যবহার হয়েছে এ বাড়িতে আপনার প্রপিতামহের গুপ্তধন খোঁজার কাজে।

চোয়াল ঝুলে পড়ল বেচারী নগেনবাবুর।

ইন্দ্রনাথ দু হাতে গুলতির মত কাঠটার দুটো শাখা চেপে ধরে বাকী কাঠটা মাটির দিকে নামিয়ে বললে, এইভাবে ধরে হেঁটে যেতে হয় মাটির ওপর দিয়ে। যার ই-এস-পি অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় অতি অনুভূতি শক্তি আছে, তার হাতে যাত্নকাঠি কেঁপে ওঠে মাটির তলায় লুকোন জিনিসের ওপর দিয়ে হেঁটে গেলেই—দম নিল ইন্দ্রনাথ, শিবাজীর এই ক্ষমতাটুকুই কেবল ছিল না। থাকলে কোনকালে গুপ্তধন উদ্ধার করে নিয়ে ভাগলবা হয়ে যেত বাড়ি ছেড়ে। আরে হ্যাঁ···শিবাজীরই যাত্নকাঠি এটা। জোগাড় করেছিল জাকার্তা থেকে। খালি বাড়িতে এত বছর একলা থেকেছে শুধু গুপ্তধনের লোভেই। তারপর আপনি এসে পড়লেন। আপনাকে তাড়ানো দরকার। তিন-তিনটে বছর কাটল ছটফট করে। তারপর ভগবান মুখ তুলে চাইলেন। ঐ টিলার ওপর ভাঙা ওয়াচ টাওয়ারে এসে আস্তানা নিল এক হিপি। আসলে সে হিপি নয়—একজন আমেরিকান বৈজ্ঞানিক। যে বিষয়টা নিয়ে গবেষণা, তা নিয়ে আমেরিকায় অনেক হাসি টিটকিরি হজম করে এবং সরকারি মহল থেকে ধাতানি খেয়ে এসেছিল এই নির্জন অঞ্চলে হাতের কাজ শেষ করতে।

বৈজ্ঞানিক···আমেরিকান···!—নগেনবাবু মনে হল এবার অজ্ঞান হয়ে যাবেন।

আজ্ঞে। প্রতিবেশীর খবর-টবর নেন না বলেই কিছু জানতে পারেননি। খোঁজ নিয়েছিল কিন্তু শিবাজী। নির্জনে গুপ্তধন খোঁজার আরেক বাধাকে গলাধাক্কা দিয়েই বিদেয় করত—নইলে সাপের ছোবল

দিয়ে মারত। কিন্তু গবেষণার বিষয়টা শুনেই যেন আকাশের চাঁদ খসে পড়ল হাতে। চুক্তি হয়ে গেল হিপি বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে। কিছু মানুষ আর জন্তুকে অদৃশ্য করে দিয়ে এমন ভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যেন আপনি চলে যান এ বাড়ি ছেড়ে। বিনিময়ে শিবাজী গুপ্ত-ধনের বখরা দেবে বৈজ্ঞানিককে। ভাল কথা, আপনার প্রপিতামহের দুই ছেলের একজন আরেকজনের হাতে খুন হয়েছিল বলেই মনে হয়। মোটেই অদৃশ্য হয়নি—লুকিয়ে ফেলা হয়েছিল শুধু লাশটাকে।

কোথায় সেই হারামজাদা ?

কোন হারামজাদার কথা বলছেন ? শিবাজী ? সে এখন অনেক দূরে—না, অদৃশ্য অবস্থায় নয়। বৈজ্ঞানিকও চম্পট দিয়েছে আসল মেশিনটা নিয়ে—যা পড়ে আছে, তা কারোরই কাজে লাগবে না।

আপনিই তাহলে—

ভাগিয়ে দিয়েছি দুজনকেই কাল রাতে। ঘুম হয়নি ঐ জন্যেই—হাই তুলল ইন্দ্রনাথ, এই যাদুকাঠিটা কেবল নিয়ে রেখেছি শিবাজীর কাছ থেকে আপনাকে দেব বলে—দেখুন চেষ্টা করে, পাইলেও পাইতে পারেন লুকোন রতন।

রেগে তিনটে হয়ে গুলতির মত বস্তুটা নিয়ে মট মট করে চার টুকরো করে ফেললেন নগেনবাবু—নিকুচি করেছে গুপ্তধনের। কিন্তু আমি জানতে চাই মানুষ আর জন্তু অদৃশ্য হয়ে আবার ফিরে আসত কি করে ? মানুষগুলোই বা পাগল হয়ে যেত কেন ?

আমতা আমতা করে ইন্দ্রনাথ বললে, রেগে যাচ্ছেন কেন ? ঐ একটা ব্যাপারেই শুধু আমি কেন, দুনিয়ার বড় বড় বৈজ্ঞানিকরা হালে পানি পাচ্ছে না। ফিলাডেলফিয়া এক্সপেরিমেণ্টের নাম শুনেছেন ? ১৯৪৩ সালে ফিলাডেলফিয়া নেভী ইয়ার্ডে গোটা একটা জাহাজকে লোকজন সমেত অদৃশ্য করে দিয়ে আবার দৃশ্যমান করে তোলা হয়েছিল অন্য এক জায়গায় ? শোনেননি ? তাহলে এখন শুনে রাখুন। তীব্র ম্যাগনেটিক অনুরণন দিয়ে নাকি বস্তুর আণবিক গঠনে হেরফের ঘটিয়ে তাকে অদৃশ্য করে দেওয়া যায়। মানুষের ক্ষেত্রে অনেকে পাগল হয়ে

গেছিল। মারাও গেছিল—তাই ধামাচাপা দিয়ে দেওয়া হয় এক্সপেরিমেণ্টটাকে—

ননসেন্স !

আইনস্টাইন তাঁর ইউনিফায়েড ফিল্ড থিওরি নিয়ে এমন একটা পর্যায় পর্যন্ত গবেষণা করেছিলেন যা থেকে অদৃশ্যকরণ খুব একটা অসম্ভব নয় বলেই অনেকে মনে করেন—

বোগাস।

হিপি বৈজ্ঞানিক এই রকমই একটা ছোটখাট মেশিন বানিয়ে ট্রায়াল দিয়ে চলেছিল ঐ ওয়াচ টাওয়ারে বসে। ওখান থেকেই যন্ত্রটাকে ফোকাস করা যায় শুধু মাঠের ওপর—আমাদের ভয় দেখানর জন্যে গতকাল সমুদ্রের ধারেও ফোকাস করে অদৃশ্য করা হয়েছিল কচ্ছপটাকে—

দূর মশাই—হুঙ্কার দিয়ে বললেন নগেনবাবু, আমি যুক্তি প্রমাণ ছাড়া—

তর্ক করতে ভালবাসেন না—মাথা চুলকে বললে ইন্দ্রনাথ, আমিও যুক্তি-প্রমাণ ছাড়া মুখ খুলতে ভালবাসি না।—তা এখন কি করবেন ঠিক করলেন ?

কি করব ? প্রবল বেগে গোঁফ টানতে টানতে নগেনবাবু বললেন, আপনাদের সঙ্গে কলকাতায় ফিরে যাব। এই হতচ্ছাড়া জায়গায় আর এক দণ্ডও নয়।

সেই ভাল—বলে নস্যির ডিবে বার করে প্রবল বেগে একটিপ নস্যি নিল ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

রাঙাদিদার চিঠি

নলিনী দাশ

'না ভাই, ঐ ধরনের কাজে তুমি সুবিধা করতে পারবে বলে মনে হয় না। আমার মনে হয় লেখা-পড়ার কাজই তোমার পক্ষে ভাল। কি বল ?···বাবা-মার স্মৃতি চিহ্ন ঘড়ি, আংটি কখনও বিক্রি করতে হয় ? অমন কথা মনেও এনো না'··

রাঙা দিদার চিঠিটা পড়ে নির্মল হাসবে কি কাঁদবে ভেবে পেল না। তার ব্যাগে এখন আছে মাত্র সাড়ে সাতাশ টাকা! সাড়ে সাঁইত্রিশ টাকা থাকতে পারত অবশ্য। কিন্তু পঞ্চু বেয়ারার পিতৃদায়, তাকে কান্নাকাটি করতে দেখে সে দশটা টাকা দিয়েছে। এখন তার মনে হচ্ছে যে পঞ্চুর আর্থিক অবস্থা তার চেয়ে কিছুটা অন্তত: ভালো তার একটা চাকরি তো আছে। আর নির্মলের কোনো উপার্জনের রাস্তা জানা নেই। সাড়ে সাতাশ টাকায় কতদিন চলবে ? ঘরভাড়া অবশ্য আগাম দেওয়া আছে। কিন্তু—খাবে কি ?

এত কথা অবশ্য সে রাঙাদিদাকে জানায় নি। তার যে একেবারে কপর্দকশূন্য অবস্থা একথা তিনি অনুমান করতে পারেন নি। কেউই পারে না। দক্ষিণ কলকাতায় সুখনীড় নামে এই ঝকঝকে বোর্ডিং হাউসে যারা থাকে তারা কেউ চাকরে, কেউ ব্যবসায়ী, তিনতলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ অনুমতি নিয়ে কয়েকটি ছাত্রও থাকে। এরা সকলেই মোটামুটি অবস্থাপন্ন। রুচি সম্মত বেশবাসে সুশ্রী নির্মলকে এদেরই মত একজন সম্পন্ন বোর্ডার বলে মনে হয়। কিন্তু তার ব্যাগের মধ্যে মাত্র সাড়ে সাতাশ টাকা। ভাবলেও হাত-পা হিম হয়ে যাচ্ছে। নাঃ,

আর সে চিন্তা করে, মন খারাপ করে ঘরে বসে থাকবে না। কি লাভ তাতে?

বেশ বেলা হয়েছে। সকালে চায়ের সঙ্গে খাওয়া টোস্ট দুখানা কোনকালে হজম হয়ে গেছে। তবু কেবলমাত্র এক পেয়ালা চায়ের অর্ডার দিয়ে নির্মল বসবার ঘরে খবরের কাগজ খুলে বসে 'কর্মখালি'র বিজ্ঞাপনগুলো দেখতে লাগল। অফিসযাত্রীরা সবাই কাজে চলে গেছে। অধ্যাপক সঞ্জয়বাবুর বোধহয় দেরিতে ক্লাস, তিনি বসে অবসর পত্রিকা পড়ছেন। দু-একবার ঘড়ি দেখলেন, নির্মলের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে ভদ্রলোক পত্রিকা রেখে উঠে পড়লেন।

সৌমিত্র, বিকাশ আর সব্যসাচী কি একটা তর্ক তুলে ঘর সরগরম করেছে। তাদের ছুটি নাকি আজ? কিংবা ক্লাস ফাঁকি দিয়েছে। মাঝে মাঝে নির্মল ওদের আলোচনায় যোগ দেয়। কিন্তু আজ ওদের দেখে ভারি হিংসে হল তার। সেও তো ওদের মতন নিশ্চিন্তমনে পড়াশুনা করছিল। কি দরকার ছিল মণিদিদার ওরকম ফট করে মরে যাবার? গলার কাছটা কেমন যেন ব্যথা করে উঠলো। চোখ মুছে, হাতের কাগজটা একটু সরাতেই জনার্দনবাবুর সঙ্গে চোখাচুখি হয়ে গেল। একমাথা পাকা চুল-ওলা সৌম্য, হাসিখুশি বৃদ্ধটিকে বেশ লাগে নির্মলের।

মাঝে মাঝেই দুজনে সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজনীতি নানা বিষয়ে আলোচনা করে। সঞ্জয়বাবু, সিদ্ধার্থবাবু, এঁরাও যোগ দেন। দুদিন 'আপনি' বলার পর থেকেই জনার্দনবাবু নির্মলকে 'তুমি' বলতে শুরু করেছেন। ভালোই লাগে।

হঠাৎ জনার্দনবাবুর হাতে অবসর পত্রিকা দেখে নির্মলের বুকের ভিতরটা ছাঁৎ করে উঠল। সবাই আজ এই পত্রিকা নিয়ে পড়েছে কেন? তার নামে কিছু ছাপা হয়নি ত? সেত বারবার অনুরোধ জানিয়েছিল যেন তার নাম পত্রিকায় না ছাপা হয়!

মুখে একটু হাসি টেনে এনে সে জনার্দনবাবুকে জিগ্যেস করল 'আপনি অবসর পড়তে ভালোবাসেন বুঝি?'

একটু অপ্রস্তুত ভাবে জনার্দনবাবু জবাব দিলেন, 'না, তেমন কিছু নয়, তবে বেশ অবসর কাটানো যায়'—বলেই নিজেরই রসিকতায় হো-হো করে হেসে উঠলেন। রাঙাদিদার কথা মনে পড়ে যেতেই নির্মল বলে উঠল, 'আমার কিন্তু মনে হয় বাজারে চলতি অধিকাংশ পত্রিকার চেয়ে অবসর উঁচু মানের। অবশ্য আরো ভালো যে হতে না পারত, তা নয়'—

পেটের মধ্যে ছুঁচোর ডন-বৈঠক শুরু হয়ে গেছে। জনার্দনবাবু শুরু করেছিলেন, 'মাথা-ওলা ছেলেছোকরারা যদি পত্রিকার কাজে যোগ দেয় তাহলে'—

'সুযোগ কোথায় তাদের?' বলল নির্মল, 'মুরুব্বির জোর না থাকলে কোনো পত্রিকার দপ্তরে ঘেঁসাই যায় না'—জরুরি কাজের অজুহাতে সে জনার্দনবাবুকে এড়িয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। ক্যান্টিনে খাবার সঙ্গতি না থাকলেও ত সে উপোস করে থাকতে পারবে না। কি খাবে? বড় রাস্তা দিয়ে কিছুদূর এগিয়েই সে দেখল একটা পার্কের পাশে ধামা-ভরা ছাতু আর ডালা-ভরা পেয়াঁজ কাঁচালঙ্কা আর আচার সাজিয়ে বসে আছে ছাতুওলা। ঝকঝকে থালায় ছাতু মেখে পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে খাচ্ছে কয়েকটি মজুর, রিকশাওলা আর ফেরিওলা। নির্মলের ভারি লোভ হচ্ছিল ওদের পাশে ফুটপাথে উবু হয়ে বসে ছাতু মেখে খায়। কিন্তু আজীবনের সংস্কার আর অভ্যাসের ফলে সে তা করতে পারল না, কাগজের ঠোঙায় করে ছাতু, পেঁয়াজ লঙ্কা আর আচার কিনে নিজের ঝোলায় রাখল। এই হবে তার আজকের আহার।

সুখনীড়ে ঢোকার পথেই আবার জনার্দনবাবুর সঙ্গে দেখা। ভদ্রলোক এক গাল হেসে জিগ্যেস করলেন, 'কাজ হয়ে গেল?' ঘাড় নেড়ে নির্মল সম্মতি, জানাল। অফিসঘর থেকে ম্যানেজার অনন্তবাবু ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আজ তো এখনও আপনি খেলেন না নির্মলবাবু?'

নির্মলের কানদুটো ঝাঁঝা করে উঠল। মনে হল যেন তার বাহারে শান্তিনিকেতনী ঝোলার মধ্যে ছাতুর ঠোঙা সবাই দেখতে পাচ্ছে আর মনে মনে হাসছে! অসংলগ্নভাবে সে বলল, 'না-মানে-ইয়ে-আজ একটু

বাইরে'—তার শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে জনার্দনবাবু প্রশ্ন করলেন, 'বাইরে খাবে বুঝি?'

নির্মলের ভারি রাগ হল। তার বলতে ইচ্ছে করল, 'আমি খাই বা না খাই তাতে আপনাদের কি মশাই?' কিন্তু স্বভাবসিদ্ধ ভদ্রতার বশে সে কেবল সংক্ষেপে 'হুঁ' বলে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল।

তিনতলার পূবদক্ষিণ কোণের ছোট্ট সুন্দর ঘরটি এখন তার একমাত্র নিরাপদ আশ্রয়। যদিও ধারে কাছে কেউ ছিল না, তবু সে ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে খিল তুলে দিল। মুখে হাতে সামান্য জল দিয়ে এসে সে একগ্লাস জল আর প্লেটে ছাতুর সঙ্গে পেঁয়াজ, লঙ্কা আর আচার সাজিয়ে খেতে বসল। রীতিমতন উপভোগ করল সে তার এই নতুন রকমের মধ্যাহ্নভোজন।

তারপর রাঙাদিদার চিঠির উত্তর দেবার পালা। আজ সে তার নিজের জীবনের সমস্ত কথাই খোলাখুলি জানাবে তাঁকে। সত্যিই বড় বিচিত্র তার এই উনিশ বছরের জীবন। তার বাবা নাকি মস্ত পণ্ডিত কিন্তু অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। শৈশবে সে তার বাবা-মাকে হারিয়েছিল, তাঁদের কথা তার মনেও পড়ে না। কোনো আত্মীয় স্বজনকে সে কোনোদিন চোখেও দেখেনি। যিনি তাকে পরম আদরে মানুষ করেছিলেন, সেই মণিদিদা ছিলেন তার দিদিমার সই। বাবা-মার মৃত্যুর পর থেকে তার খাওয়া পরা, লেখাপড়ার সমস্ত খরচ দরাজহাতে জুগিয়েছিলেন এই মণিদিদাই। পরম আদরে তাকে মানুষ করেছিলেন মণিদিদা। গ্রামের স্কুল থেকে ফার্স্ট ডিভিশনে মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করবার পরে তাকে তিনি কলকাতায় পাঠিয়ে ভালো কলেজে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। কলেজ হোস্টেলে সীট না পেয়ে তাকে রেখেছিলেন এই ব্যয়বহুল সুখনীড়ে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত জামা-জুতো, বইপত্র তিনি তাকে ছোটবেলা থেকে দিয়েছেন না চাইতেই।

হঠাৎ গতমাসে মণিদিদা যখন হার্ট ফেল করে ইহলোক ছেড়ে চলে গেলেন তখনই নির্মল প্রথম বুঝল যে এই পৃথিবীতে সে সম্পূর্ণ নিঃস্ব আর নিঃসঙ্গ। তার কেউ নেই, কিছু নেই। মণিদিদা তার ভবিষ্যতের

জন্য কোনো ব্যবস্থাই করেন নি। তাঁর ছেলেমেয়েরা তার জন্য আর একটি কপর্দকও ব্যয় করতে প্রস্তুত নন। কি করবে এখন নির্মল? পড়াশুনা করবে কি, এখন উদরান্নের সংস্থান করাই ত তার পক্ষে এক বিরাট সমস্যা! শোকের আঘাতে কয়েকদিন স্তম্ভিত হয়ে থাকার পরে সে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে চাকরির দরখাস্ত পাঠাতে শুরু করল। দ্বারে দ্বারে হাঁটাহাঁটি করতে লাগল।

এবার নির্মল আবিষ্কার করল যে তার কোনো কাজের যোগ্যতা নেই। সে বি-এ পাশ করেনি, টিচার্স ট্রেনিং নেয়নি, শর্টহ্যাণ্ড টাইপিং জানে না, কোনো টেকনিক্যাল ট্রেনিংও নেই। লিখতে পারে বটে সে, স্কুলকলেজের পত্রিকায় তার লেখা ছাপা হয়েছে, সে সব পত্রিকা সম্পাদনার কাজ সে করেছে! কিন্তু কলকাতার কোনো নামী পত্রিকার অফিসে সে পাত্তাই পেল না, এমন কি কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে দেখাও করতে পারল না। তার লেখা অনেক পত্রিকার অফিসে জমা পড়ল বটে, কিন্তু সেইখানেই সে ব্যাপারের পরিসমাপ্তি ঘটল। তার মতন স্বল্পভাষী, নম্র, মৃদু স্বভাবের ছেলের পক্ষে নিজেকে জাহির করা কঠিন, বলতে গেলে অসম্ভব।

হঠাৎ একদিন অবসর পত্রিকার পাতা খুলে চিঠিপত্রের আসরে রাঙাদিদার লেখা তার মনকে গভীরভাবে নাড়া দিল। কেমন সহজ, সুন্দরভাবে তিনি নানাজনের নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন, প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে, যুক্তি, বুদ্ধি, উপদেশ দিয়েছেন। মণিদিদার কথা মনে পড়ে তার মনটা কেমন করে উঠল। নিজেকে আর ভাববার অবসর না দিয়ে সে রাঙাদিদার কাছে চিঠি লিখে নিজের সমস্যার কথা জানাল। সঙ্গে সঙ্গে অনুরোধ জানাল যেন তিনি পত্রিকার পাতায় না লিখে ডাকে তার চিঠির উত্তর দেন।

নির্মলের সে অনুরোধ রেখেছিলেন রাঙাদিদা। নির্মল নিজের শোচনীয় আর্থিক অবস্থার কথা খুলে লেখেনি তাই তিনি তাকে পড়াশুনা আর সাহিত্যচর্চা দুই চালিয়ে যেতে বলেছিলেন। এবার সে সব কথা লিখল, কিছুই গোপন করল না। নিজের দোষ দুর্বলতার কথা খুলে লিখল। সে যদি তেমন করিৎকর্মা ছেলে হত, নিশ্চয় যা

হোক কিছু কাজ জুটিয়ে নিত, সস্তা মেসে বা বস্তির ঘরে থেকে লেখা-পড়া, সাহিত্যচর্চা সবই চালিয়ে নিত। কিন্তু ছোটবেলা থেকে অতি আদরে মানুষ হয়ে সে কিছুটা অপদার্থ হয়ে গেছে—বিপদে এখন দিশে হারা হয়ে পড়েছে।

দুবার সে চিঠি লিখে ছিঁড়ে ফেলল। ভাবল এ সব কথা রাঙা-দিদাকে জানিয়ে লাভ কি? যতই তিনি বুদ্ধিমতী আর দরদী মহিলা হোন না কেন, তার এই সমস্যার সমাধান কি ভাবে করবেন? তৃতীয়বার চিঠি লিখে সে নিজেকে ভাববার অবকাশ না দিয়ে খাম বন্ধ করে ডাকে ফেলে এল। ঝোলায় করে কিনে আনল মুড়ি আর চিনেবাদাম। এই হবে তার রাতের ডিনার সম্ভব হলে সকালের ব্রেকফাস্টও।

এর পরের কয়েকটা দিন কাটল আশা আশঙ্কার মধ্যে দোলায়মান অবস্থায়! রাঙাদিদা কি এ-রকম চিঠির কোনো উত্তর দেবেন, নাকি পড়েই বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দেবেন? উত্তর দিলেই বা কি লিখতে পারেন? কটা মিষ্টি সহানুভূতির কথা ছাড়া আর কি?

ছাতু আর মুড়ি খেয়ে দিন কাটতে লাগল নির্মলের। সঙ্গে কিছু ছোলাভাজা আর চিনেবাদাম। সৌমিত্র সব্যসাচীরা ঠাট্টা করে বলে, 'ব্যাপার কি নির্মলবাবু? রোজ রোজ কে এত নেমন্তন্ন খাওয়ায়? ডাইনিং রুমে আর দেখাই যায় না যে!'

নির্মল হেসে বলে, 'আরে না, বাইরে কাজ থাকে তাই'…।

সঞ্জয়বাবু, সিদ্ধার্থবাবুরা বলেন, 'আজকাল আর বসবার ঘরে দেখি না যে আপনাকে? সাহিত্য আলোচনা ছেড়ে দিলেন নাকি?'

নির্মল এড়িয়ে যায়, 'ক'দিন একটু ব্যস্ত আছি, তাই'। ওদিকে টাকাও শেষ হয়ে গেল। লণ্ড্রি থেকে কাপড় আনতে হল। সাবান, শেভিং ক্রিম কিনতে হল। সাড়ে সাতাশটাকা শেষ হবার পরে সে বাধ্য হয়ে দুচারখানা প্রিয়-বই বিক্রি করে দিল। মনে হল যেন তার বুকের পাঁজর দু-চারখানা গুঁড়িয়ে গেল। আর কি কোনোদিন বই কিনতে পারবে?'

অবশেষে একদিন এসে পৌঁছল বহু প্রত্যাশিত সেই রাঙাদিদার

চিঠি। সুন্দর নীলাভ খামের ওপর মুক্তোর মতন অক্ষরে তার নাম ঠিকানা লেখা। কিন্তু···কিন্তু এত পাতলা কেন চিঠিটা। দৌড়ে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েও নির্মল অনেকক্ষণ চিঠিটা খুলতে পারল না।

রাঙাদিদা কি রাগ করেছেন ? তিনি কি মামুলি ছুটো ভদ্রতার কথা লিখেছেন খালি ? অবশেষে সে সাহস করে চিঠিটা খুলে পড়ে ফেলল—ছোট্ট ছুলাইনের চিঠি—আগামী কাল রাত আটটার সময় রাঙাদিদা তাকে বড় রাস্তার চিনে রেস্তোরাঁয় নেমন্তন্ন করেছেন।

প্রথমেই নির্মলের মনে ভারি আনন্দ হল। রাঙাদিদা কি অন্তর্যামী ? তিনি কেমন করে জানলেন যে সে চিনে খাবার খেতে ভালবাসে ? পরক্ষণেই মনটা দমে গেল—নিশ্চয় আগে খাইয়ে-দাইয়ে তারপর তাকে বলে দেবেন যে তার সমস্যার কোনো সমাধান নেই। আবার খুশি হয়ে উঠলো সে। তবুত তার রাঙাদিদার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় হবে। নিঃসঙ্গ জীবনে একটিমাত্র আপনজন সে পেয়েছে, এবার ত তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ হবে।

এর পরের প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা সময় নির্মল যেন কতকটা উদ্‌ভ্রান্তের মতন কাটাল। জনার্দনবাবুকে এড়িয়ে গেল। সিদ্ধার্থবাবুর কথার উল্টোপাল্টা জবাব দিল। বিকাশ-সৌমিত্রদের ঠাট্টাতামাশার ভয়ে পালিয়ে বেড়াল। অবশেষে নির্দিষ্ট সময়ের প্রায় আধঘণ্টা আগে সে সেজেগুজে পরিপাটি পোশাকে চিনে রেস্তোরাঁয় গিয়ে হাজির হল।

এ কি ব্যাপার ! আজ কি সুখনীড়ের সব কটি বোর্ডার এসে মিলিত হয়েছেন এই চিনে রেস্তোরাঁয় ? একদিকে বসে খাচ্ছেন সঞ্জয়বাবু আর সিদ্ধার্থবাবু। নির্মলকে দেখে তাঁরা হেসে বললেন, 'আপনিও এখানে ?'

সৌমিত্র, বিকাশ, সব্যসাচী আর ছুটি অপরিচিত ছেলে দল বেঁধে, ছুটো টেবিল জোড়া দিয়ে বসে চাওমিন খাচ্ছিল। নির্মলকে দেখে বিকাশ হৈ-হৈ করে উঠল, 'আসুন বন্ধু, আমাদের টেবিলে বসুন।' সব্যসাচী বলল, 'আপনি বুঝি আজকাল এখানে খান—তাই সুখনীড়ের ডাইনিং রুমে দেখা যায় না ?' তাকে ইতস্ততঃ করতে দেখে সৌমিত্র

বলল, 'বৃথাই ওকে ডাকছিস— ওর তো রোজই সেই রহস্যময় নেমন্তন্ন থাকে আজকাল।' সবাই হেসে উঠল।

কোনোমতে ছেলের দলকে এড়িয়ে নির্মল ঘরের অন্য প্রান্তে চলে গেল। কি আপদ! এখানে আবার জনার্দনবাবু একটা টেবিলে একা বসে আপেলের রস খাচ্ছেন। নির্মলকে দেখে একটু সলজ্জ হাসি হেসে বললেন, 'চমৎকার আপেলের রস। এসো ভাই, তোমার জন্য এক গ্লাস অর্ডার দিই'—

নির্মল কিন্তু তাঁর হৃদ্যতার উত্তরে বিরসভাবে বলল, 'মাফ করবেন...

আমার একটা কাজ...মানে ওদিকে'...একটু দূরে একটা টেবিলে বসে নির্মল ঘড়ি দেখল আটটা বাজতে আর মাত্র পনের মিনিট বাকি।

জয়ন্তবাবু আর সিদ্ধার্থবাবু খাওয়া শেষ করে উঠে পড়েছেন কিন্তু

সব্যসাচী—সৌমিত্ররা হৈ হৈ করে খেয়েই চলেছে। জনার্দনবাবুই বা একগ্লাস ফলের রস খেতে এত সময় নিচ্ছেন কেন? ঘড়িতে এখন আটটা বাজতে দশ মিনিট।

ছেলের দল খাওয়া শেষ করে বিলটিল মিটিয়ে দিল, নির্মলকে আবার ঠাট্টা করে হাসতে হাসতে চলে গেল। জনার্দনবাবুর আপেলের রসে শেষ চুমুক দেওয়া বাকি। আটটা বাজতে পাঁচমিনিট দেখে নির্মল ঘরের একেবারে অন্যপ্রান্তে চলে গেল।

ঢং-ঢং-ঢং করে ঘড়িতে যেই আটটা বাজতে শুরু করল, জনার্দনবাবু ঠিক খুঁজে খুঁজে নির্মলের দিকে এগিয়ে এলেন।

বিব্রত হয়ে নির্মল বলল, 'কিছু মনে করবেন না···কিন্তু···আমি আমার'···

'একজনের সঙ্গে দেখা করবার কথা আছে, তাই না?' মাথা নেড়ে নির্মল সম্মতি জানাল।

'কিন্তু, তিনি ত আসবেন না, মানে তিনি এসেছেন', তাঁর উল্টোপাল্টা কথায় নির্মল বিভ্রান্ত হয়ে গেল। তার পাশের চেয়ারটায় বসে পড়ে জনার্দনবাবু বললেন, 'রাঙাদিদা বলে সত্যিই কেউ নেই ভাই'—

নির্মলের মনের মধ্যে সব কিছু যেন কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। রাঙা দিদা নেই। রাঙাদিদা নামে সত্যিই কেউ নেই? একটা গভীর বেদনায় সে অভিভূত হয়ে পড়ল। মণিদিদা তার একমাত্র বন্ধু ছিলেন, তাঁকে হারানোর শূন্যতাবোধ সে রাঙাদিদাকে পেয়ে পূর্ণ করতে চেয়েছিল। কিন্তু রাঙাদিদা নেই! তবু সে প্রশ্ন করল, 'তাহলে চিঠিগুলো···'

'আমিই রাঙাদিদা নামে চিঠি লিখি—তোমাকে আজ আমিই এখানে ডেকেছি,'—কোমল স্বরে বললেন জনার্দনবাবু। তবু নির্মলকে বিভ্রান্ত দেখে জনার্দনবাবু তার হাত ধরে বললেন, 'এত দুঃখ করছ কেন ভাই? আমি তো রয়েছি। রাঙাদিদা নেই, ধরে নাও আমি রাঙাদাদু!' নির্মলের মুখে এতক্ষণে হাসি ফুটল।

জনার্দনবাবুও হাসলেন। বললেন, 'সুখনীড়ে কথাটা কেউ জানেনা—

অবসর পত্রিকাটা আমাদের, আমিই পত্রিকা চালাই। বয়স হয়েছে, একা আর পেরে উঠছি না। —এসো না ভাই আমার সহকারী হবে, নতুন পরিকল্পনা নিয়ে নতুনভাবে পত্রিকা গড়ে তুলব।'

নির্মল যেন নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছে না! এত সহজে তার সব সমস্যার সমাধান করে দেবেন—জনার্দনবাবু—না—কি রাঙাদাদু ?

তিনি তখনও বলে চলেছেন, 'তোমাকে ফাঁকি দেবনা, উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাবে। ফাঁকি দিতেও দেব না, রীতিমতন খাটিয়ে নেব। কি ভাই, রাজি তো ?'

আনন্দে নির্মলের চোখে জল এসে গিয়েছিল। আর সে দুনিয়ায় একা নয়। একটি পরমাত্মীয়, নিরাপদ আশ্রয় আর মনের মতন জীবিকা, সে সবই পেয়ে গেল এই রাঙাদাদুর কাছে। জনার্দনবাবুকে প্রণাম করে সে রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বলে উঠল, 'নিশ্চয় রাজি রাঙাদাদু!'

কেষ্টদাস বৈরাগী

মঞ্জিল সেন

টোটনের মন উসখুস করছিল, অনেকদিন কেষ্টদাস বৈরাগী আসেনি। ও অবশ্য কেষ্টদাসকে বোরেগীদাদা বলে ডাকে। মেলায় মেলায় সে ঘুরে বেড়ায়, তারপর হুট করে একদিন এসে হাজির হয়, 'জয় রাধে' বলে হাঁক দেয়। মেলা থেকে ও নিয়ে আসে গল্পের ঝুলি, কত মজার মজার যে ঘটনা, তা শুনবার জন্য হা পিত্যেস করে থাকে টোটন। শুধু ও কেন, ওর মাও খুব ভক্তি করেন বোরেগীদাদাকে। লম্বা-চওড়া চেহারা, গৌরবর্ণ রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে, মাথায় বড় বড় চুল, গেরুয়া আল্‌খাল্লায় সন্ন্যেসী সন্ন্যেসী মনে হয়। যেমন দরাজ গলা, তেমনি মিঠে একতারার বোল্।

টোটন মাকে জিগ্যেস করেছিল বৈরাগী মানে কি। মা জবাবে বলেছিলেন, 'বোধহয় যাদের সংসারে বৈরাগ্য আসে, পথের টানে বেরিয়ে পড়ে, তাদেরই বৈরাগী বলে।'

টোটনের সঙ্গে কিন্তু কেষ্টদাসের বেশ একটা মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। যখনই আসে, ঝোলা থেকে আতাটা, পেয়ারাটা ওর জন্য নিয়ে আসে। মা অনেক করে বলা সত্ত্বেও ওদের বাড়িতে কিন্তু কোনদিন অন্ন গ্রহণ করেনি কেষ্টদাস। হেসে বলেছে, 'দু-মুঠো চাল আর দুটো আলু দাও মা জননী, গাছের তলায় ফুটিয়ে নেব।' ওর ঝোলাতেই আছে একটা মাটির হাঁড়ি, অ্যালুমিনিয়মের একটা থালা-গেলাস, একটা তেলের শিশি আর একটা দেশলাই। আর আছে একটা গামছা আর

গেরুয়া রঙের একটা লুঙ্গি। এই নাকি ওর সংসার। সংসারের কথা উঠলেই কেষ্টদাস হেসে গেয়ে ওঠে :

'মিছে এ ভব সন্‌সার
তুমি কার কেবা তোমার !
আমি আমি করি আমি
হাসেন হরি অন্তর্যামী।'

কেষ্টদাস নিজেই মুখে মুখে গান রচনা করে।

আজ টোটনের পড়ায় একেবারেই মন বসছিল না, ভাবছিল বোরেগী দাদা এলে বেশ হত। ঠিক তখুনি পথের দিক থেকে দরাজ গলা ভেসে এল ওর কানে :

'চিন্তামনি চিন্তা করে
সবার চিন্তা তার 'পরে-
তুমি আমি চিন্তা করি,
চিন্তা করে মিছে মরি।'

টোটন প্রথমে কেমন যেন হকচকিয়ে গেল ; এই মাত্র ও কেষ্টদাসের কথা ভাবছিল, আর ঠিক সেই সময় এসে হাজির হল সে ! বোরেগীদাদা কি অন্তর্যামী ! একছুটে ও জানালার কাছে গেল। জানালাটা পথের দিকেই। হ্যাঁ, বোরেগীদাদাই আসছে, ওকে দেখে তার মুখে ছড়িয়ে পড়ল স্নিগ্ধ হাসি।

'মা, বোরেগীদাদা,' শুধু এই কথাটা বলেই ও ছুট লাগাল। কেষ্টদাস ততক্ষণে উঠোনের দরজার কাছে পৌঁছে গেছে। টোটন কাছে যেতেই ওর ডান হাতটা নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে বলল, 'কেমন আছ খোকা দাদা ?' টোটনকে ও ওই নামেই ডাকে।

টোটন বলল, 'ভাল, কিন্তু তুমি এবার অনেকদিন পরে এলে বোরেগীদাদা।'

'তা হ্যাঁ চার মাসতো হবেই,' কেষ্টদাস হিসেব করে বলল, 'এখন আসতেছি মেদিনীপুর থেকে, ওখানে বামুনপাড়ায় শীতলা মন্দিরের কাছে বড় মেলা বসে। বোশেখের পয়লা থেকে সেই অক্ষয় তৃতীয়া পর্যন্ত

চলে মেলা। অনেক দূর থেকে মানুষ জন আসে ওখানে, একমাস ধরে উচ্ছব চলে।'

'তুমি মেলায় কি করলে?' টোটন জিগ্যেস করল।

'আমি?' বৈরাগী হাসল, 'আমি দেখলাম, শুনলাম, নাচলাম, গাইলাম।'

'নাচলে?' অবাক দৃষ্টিতে তাকাল টোটন।

'আরে আমার নাচ কি আর যাত্রা-থেটারের নাচ খোকা দাদা', বৈরাগী হেসে উঠল, 'অঙ্গ দুলিয়ে ঘুরে ঘুরে একতারা বাজিয়ে গান করলাম, সেই আমার নাচ।'

'মেলায় সার্কাস এসেছিল?' টোটন সাগ্রহে প্রশ্ন করল।

'না, সার্কাস আসেনি, তবে একটা যাত্রার দল এয়েছিল, সে এক মজার ব্যাপারগো খোকাদাদা—'

'কি মজার ব্যাপার?' টোটন উৎসুক হয়ে ওঠে।

'তবে শোন,' টোটনদের দাওয়ায় বেশ আয়েস করে বসল কেষ্ট-দাস। টোটনের মাও ছেলের পাশে এসে বসেছেন। বৈরাগী গাঁয়ে-গঞ্জে, শহরে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, কত মজার-মজার ঘটনা জমা হয়ে আছে তার ঝোলায়, ছোট বড় সবার জন্যই তার ঝোলায় আছে গল্পের খোরাক, তাই কেষ্টদাস কোথাও জমিয়ে বসলে বড়রাও এসে ভিড় করে।

'আমিতো গান গেয়ে মেলায় ঘুরে বেড়াই', কেষ্টদাস শুরু করল, 'যে খুশি হয়ে যা দেয় তাই আমি হাত পেতে নিই, তাতেই আমার বেশ চলে যায়। একটাতো মাত্র পেট, তাও কত দিন এক বেলা খেয়েই কাটিয়ে দিই। তা ওখানে তাই করতেছিলাম। আমি গান ধরলেই আমার চারপাশে ভিড় জমে যেত। ভগমানতো গলাটা মন্দ দেননি, আর নিজেও কিছু কিছু গান বেঁধেছি।'

'ব্যাপারটা ঘটল মেলা জমে ওঠার কয়েকদিন পরে। আমি বিকেলে একটা চায়ের দোকানের সামনে বেঞ্চিতে বসেছিলাম, সুখ দুঃখের কথা বলতেছিলাম কয়েকজনের সাথে। হঠাৎ যমদূতের মত চারজন মানুষ এসে আমাকে ঘিরে ধরল। আমিতো ভয়ে কাঁটা। তারা বলল,

অধিকারী আমাকে একবারটি দেখা করতে বলেছে, খুব নাকি দরকার।

'আমি শুধোলাম, অধিকারী আবার কে? ওরা বলল, যে যাত্রার দল ওখানে এসেছে তার অধিকারী। আমি আর কি করি, গুটি গুটি

গেলাম ওদের সাথে। অধিকারীকে দেখেইতো আমার পেরাণের ভেতরটা শুকিয়ে গেল। মোষের মত চেহারা, যেমন বর্ণ তেমন আকৃতি। উনি কিন্তু আমারে খাতির করে বসালেন। তারপর যা বললেন তা শুনে আমার চোখ কপালে ওঠে আর কি! ওদের যে বিবেকের পেলা করে, তার নাকি দুপুর হতে ধুম জ্বর, মাথা তুলতে পারতেছেনা। ওদের আর কেউ নেই। ইদিকে বিবেকের গান ছাড়া আসর জমবেনা, লোকে গোলমাল করবে, বদনাম হবে দলের। তাই আমাকে ওই বিবেকের পেলা করতে হবে।

'আমিতো শুনেই আৎকে উঠলাম। অধিকারীর কি মাথা খারাপ হয়েছে, আমি বোরেগী মানুষ, ধম্ম-কম্মের গান গেয়ে বেড়াই, যাত্রার গানের কি জানি আমি! সে কথা বললাম, অধিকারী মশাইকে। তিনি বললেন, আসর বসতে আর বেশি সময় নেই, এখন তিনি বিবেকের গান গাইতে পারবে এমন লোক পাবেন কোথায়! তিনি আমার গান শুনেছেন, ওতেই চলে যাবে। আমার মাথায় বাজ! অধিকারী মশাই নিজের মান বাঁচাবার তরে আমারে আগুনের মুখে ঠেলে দিতেছেন। তারপর আমার উপর ইট-পাটকেল পড়তে শুরু হলে, তিনি কি আর আমারে বাঁচাবেন! আমি বললাম আমার দ্বারা উটি হবে না, অত লোকের আসরে আমার পা কাঁপবে, গলা দিয়ে স্বর বেরুবেনা। অধিকারী মশাই আমার দু'হাত চেপে ধরে বললেন, তোমার কোন ভয় নেই বোরেগী, তোমারে যখন বলব, তুমি শুধু আসরে গিয়ে তোমার মনের মত গানটি গেয়ে আসবে। আর কিছু করতে হবে না তোমাকে।

'আমি আর কি করি, এত করে বলতেছে। তা আমারে পাগড়ি-টাগড়ি পরায়ে সাজায়ে দেল। আমার বুকের ভেতরটা তখন যদি দেখতে খোকাদাদা, সে কি দাপাদাপি, যেন ভূমিকম্প হতেছে। আমি মনের আনন্দে পথে পথে গান গেয়ে বেড়াই, গেরস্তের বাড়িতে গিয়ে গান করি, কিন্তু অত লোকের মধ্যিখানে গান গাওয়া বুকের পাটা দরকার।'

'গাইলে তুমি?' বড় বড় চোখ করে জিগ্যেস করল টোটন।

'তা গাইতে হল বৈকি,' কেষ্টদাস জবাব দিল, 'আমাকে ঠেলেঠুলে প্রথম যেবার আসরের ভেতর পাঠায়ে দিল, আমি ভয়ে আর চোখ খুললাম না, কোনমতে একটা গাইলাম।'

'তারপর?' টোটন জিগ্যেস করল।

'দ্বিতীয়বার মনে সাহস এল। গলা ছেড়ে গাইলাম। একটা নতুন গান বেঁধেছিলাম, সেটাই গাইলাম। দাঁড়াও তোমাদের শোনাই—'

কেষ্টদাস একতারায় টুং টাং বোল্ তুলে দরাজ গলায় গেয়ে উঠল:

'একেই বলে ঘোর কলি
মুখে সবাই হরি বলি
সুযোগ পেলে সেই মোরা
আঁকা বাঁকা পথে চলি।

দিনের বেলা সাধু মোরা
রেতে হলেম চোর—
পরের জিনিস লুটেপুটে
আঁধার হল ভোর।
আমরা সবাই সাধু দাদা
লোভের কাছে হাত-পা বাঁধা ;
দিনের বেলা ভাল মানুষ
রাত্তিরেতে চোর।'

'এ গান গাইলে?' এবার জিগ্যেস করলেন টোটনের মা, 'কি পালা ছিল।'

'কৃষ্ণসখা সুদাম,' কেষ্টদাস জবাব দিল।

'ওমা!' টোটনের মা গালে হাত দিলেন, 'ওই পালায় এই গান!'

'তা বললে কি হবে,' কেষ্টদাস এবার বেশ গর্বের সঙ্গে বলে, 'আমার গান শেষ হল আর আসর ভরে গেল হাততালিতে। সে হাততালি আর থামতেই চায়না। একজন তো একটা মেডেল দেবে বলল।'

'দিয়েছিল?' টোটন উদগ্রীব হয়ে ওঠে।

'তা আর দিল কই,' কেষ্টদাস জবাব দিল, 'দেব বললেই কি আর দেয়া যায়। তা অধিকারী মশাই পাঁচটা টাকা আর সিঁধে দিয়েছিল, খালি হাতে ফিরোয়নি।'

'মাত্র পাঁচটা টাকা,' টোটন প্রতিবাদ করে উঠল, 'তুমি ওদের মান বাঁচালে আর পাঁচ টাকা দিল! অধিকারী মশাই লোক ভাল নয়, আর তুমিও যে কি....

'কি করব বল,' কেষ্টদাস হাসল, 'বোরেগীর কি দর কষাকষি

পোষায়, না মানায়।' তারপরই উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'অনেক বেলা হল মা জননী, দুটি ভিক্ষে দাও এবার।'

টোটনের মা একটা ধামায় খানিকটা চাল, গোটাকয়েক আলু, একজোড়া কাঁচকলা, একটা পেঁপের আধখানা, এক ফালি কুমড়ো আর কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা নিয়ে এলেন।

'মা অন্নপূর্ণা আমার ভিক্ষের ঝুলি ভরে দিলেন গো,' হাসিমুখে বলল কেষ্টদাস। একটু পরেই ওর গান ভেসে এল দূর থেকে :

'আছেন হরি যথা তথা
আছেন তিনি মন্তরে—
আছেন হরি সবার মাঝে
আছেন তিনি অন্তরে।'